ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

ফারসি মরমি সাহিত্যে নারীঃ পরিপ্রেক্ষিত জালালুদ্দিন রুমির মাসনাভি

(Women in Persian Mystic Literature: The Perspective of Jalaluddin Rumi’s Mathnavi)

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মোঃ মুহসীন উদ্দীন মিয়া

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

সুমাইয়া সুলতানা জ্যোতি

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ ১৩/২০১৮-১৯

জুন, ২০২৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের এম.ফিল গবেষক সুমাইয়া সুলতানা জ্যোতি কর্তৃক আমার তত্ত্বাবধানে ফারসি মরমি সাহিত্যে নারী: পরিপ্রেক্ষিত জালালুদ্দিন রুমির মাসনাভি (Women in Persian Mystic Literature: The Perspective of Jalaluddin Rumi's Mathnavi) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও এই শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এই অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ পরিমার্জন করেছি। এর মৌলিকত্ব বিচার করে গবেষককে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপনের অনুমতি প্রদান করছি।

আরো প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গবেষকের উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভে কোনো প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের লেখা বলে চালানো) নেই।

(ড. মোঃ মুহসীন উদ্দীন মিয়া)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ফারসি মরমি সাহিত্যে নারী: পরিপ্রেক্ষিত জালালুদ্দিন রুমির মাসনাভি (Women in Persian Mystic Literature: The Perspective of Jalaluddin Rumi's Mathnavi) শিরোনামে এম.ফিল অভিসন্দর্ভের এই গবেষণা কর্মের বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে আমি কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি কোনো যৌথ গবেষণাকর্ম নয়, বরং এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম।

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমার দাখিলকৃত এ অভিসন্দর্ভে কোনো প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের লেখা বলে চালানো) নেই।

(সুমাইয়া সুলতানা জ্যোতি)
এম.ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৩/২০১৮-১৯
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার- যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আর দরূদ ও সালাম পেশ করছি সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি- যিনি পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর জন্য আদর্শ শিক্ষক এবং যাঁর উম্মত পরিচয়ে আমরা সৌভাগ্যবান ও গৌরবান্বিত। যাঁর নীতি অনুসরণের মাধ্যমেই আমাদের জীবনের কল্যাণ নিহিত। বর্তমান গবেষণা কর্মটি আমার দীর্ঘদিনের নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা ও অধ্যয়নের ফসল। মহান স্রষ্টার অসীম রহমত ও করুণায় আমি আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি।

আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আমার শ্রদ্ধেয় বাবা জনাব এ. কে. এম. রেজাউল আলম ও মা নূরুন নাহার বেবী'র প্রতি যাঁরা আমাকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন ও পরম স্নেহ-মমতায় প্রতিপালনসহ লেখাপড়া শিখিয়েছেন। জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তে ও কঠিন সময়ে সদা আমার পাশে থেকে আমাকে প্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছেন। তাঁদের একান্ত ইচ্ছাতেই আমি উচ্চতর গবেষণাকর্মে আগ্রহী হই। তাঁদের সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা আমার কর্মস্পৃহাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার বাবা মায়ের প্রতি মহান স্রষ্টার রহমত, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আমার এম.ফিল গবেষণাকর্ম তত্ত্বাবধান করেছেন ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: মুহসীন উদ্দীন মিয়া, যার সদয় নির্দেশনা ও সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে আমার এই গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। গবেষণার শিরোনাম নির্ধারণ, বিষয়বস্তু বিণ্যাস ও প্রনয়ণ সবই তার সুচিন্তিত পরামর্শে সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণাকর্মে প্রয়োজনীয় বেশকিছু দুর্লভ ফারসি বই তিনি সরবরাহ করেছেন, যা বাংলাদেশে সহজলভ্য নয়; যা আমার কাজে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

তিনি অধ্যাপনার বাইরে বিভিন্ন একাডেমিক ও জাতীয় পর্যায়ের নানানবিধ গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততার মাঝেও আমার অভিসন্দর্ভ পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এর সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন বলেই আমার গবেষণা কর্মের সমাপ্তি ও রচনা সম্ভব হয়েছে। তার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের আমার সম্মানিত শিক্ষক অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার, অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান, অধ্যাপক ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী, অধ্যাপক ড. আব্দুস সবুর খান, অধ্যাপক ড. মো: আবুল কালাম সরকার, অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, ড. আবু মূসা মো: আরিফ বিল্লাহ, ড. মো: মুমিত আল রশিদ, জনাব মোহাম্মদ আহসানুল হাদী, জনাব মো: মেহেদী হাসানসহ সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁরা প্রত্যেকেই ছাত্রজীবনে

Dhaka University Institutional Repository

আমাকে সহযোগিতা করেছেন, যার ফলে আজ আমি উচ্চতর গবেষণায় মনোনিবেশ করতে পেরেছি।

স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নকালীন বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয়ে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান স্যারকে, তাঁর প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. এম শামীম খান, অধ্যাপক ড. মো: নুরুল হুদা, অধ্যাপক ড. মো: শফিউল্লাহ, অধ্যাপক ড. মো: কামালউদ্দিন, অধ্যাপক ড. মো: আতাউল্লাহ, অধ্যাপক ড. ওসমান গণী স্যারের প্রতি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: আবুল হাসেম, অধ্যাপক ড. মো. নূরে আলম স্যারের প্রতি, যাঁদের কাছে আমি ছাত্রজীবন থেকেই ঋণী হয়ে আছি। স্নাতক পর্যায়ের বিভিন্ন বর্ষ, স্নাতকোত্তর ও এম.ফিল পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরে তাঁদের সহযোগিতা লাভ করেছি।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি ড. মোহাম্মদ ইসা শাহেদী স্যারের প্রতি; তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি আমার গবেষণাকর্মে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে ও অনলাইন মাসনাভি পাঠের আসরে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি।

আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদন ও অভিসন্দর্ভ রচনায় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলি এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকাস্থ ইরানি কালচারাল সেন্টারের লাইব্রেরি, শাহবাগ পাবলিক লাইব্রেরি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, বাংলা ও উর্দু বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি এবং আমার বিভাগের শিক্ষক মহোদয়গণের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে বই ব্যবহার করেছি। এসব গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মো: ইবরাহীম খলিল ভাইসহ বিভাগীয় সকল সহযোগী ভাইদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমাকে এম.ফিল গবেষণাকর্ম সম্পাদনে বিগত তিন বছরে বিভিন্ন সময়ে যারা মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন, তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এছাড়াও আমার বড় বোন, সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, শ্রদ্ধাভাজন গুরুজনের দোয়া, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে এ গবেষণাকর্ম সমাপ্তিতে আমাকে উৎসাহিত করেছেন, তাদের সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমার এ শ্রমকে কবুল করুন। আমিন। আমার এ গবেষণাকর্ম বাংলাভাষী সকল পাঠক, গবেষকবৃন্দ এবং বিভাগীয় ছাত্র- ছাত্রীদের সামান্যতম উপকারে আসলেও আমি আমার এ পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলেই মনে করবো।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

অনু.	: অনুবাদ
আ.	: আলাইহি ওয়া সাল্লাম
খ.	: খণ্ড
খ্রি.	: খ্রিস্টাব্দ
ড.	: ডক্টর (পিএইচ.ডি)
দ্র.	: দ্রষ্টব্য
পৃ.	: পৃষ্ঠা
ব.	: বঙ্গাব্দ
মু.	: মুহাম্মদ
সা.	: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
মৃ.	: মৃত্যু
রহ.	: রহমাতুল্লাহি আলাইহি
রা.	: রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
রা.	: রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা
সম্পা.	: সম্পাদিত
হি.	: হিজরি সাল
হি.শা.	: হিজরি শামসী (ইরানি সাল)
তা.বি.	: তারিখ বিহীন
A.D.	: Anno domini
B.C.	: Before Christ
Co.	: Company
Vol.	: Volume
Ed.	: Edited / Edition
Dr.	: Doctor (Ph.d)
p.	: Page
pp.	: Pages
pub.	: Publication / published
Ltd.	: Limited
Trans.	: Translation / Translator
U.S.A	: United States of America
U.K	: United Kingdom

Dhaka University Institutional Repository

ফারসি মরমি সাহিত্যে নারী: পরিপ্রেক্ষিত জালালুদ্দিন রুমির মাসনাভি

(Women in Persian Mystic Literature: The Perspective of Jalaluddin Rumi's Mathnavi)

সারসংক্ষেপ

মরমিবাদের মূলকথা হলো পার্থিব ও আধ্যাত্মিক প্রেমানুভূতি অর্জনের মাধ্যমে পরমাত্মার একান্ত সান্নিধ্য লাভ করা। সুফিগণ স্রষ্টার সাথে তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগসূত্র স্থাপনে সক্ষম। আর এরই বহি:প্রকাশ ঘটেছে মরমি সাহিত্যের মাধ্যমে; যা সুধীমহলে ব্যাপক সমাদৃত। সুফি ভাবধারা যাঁদের হাত ধরে ফারসি সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করেছে, মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি তন্মধ্যে অন্যতম।

জালালুদ্দিন রুমির দ্বিপদী কাব্যসম্ভার মাসনাভি। যার ২৬০০০ বেঈত জুড়ে রয়েছে কুরআন-হাদিসের শিক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাপ্রবাহ। যা মানুষের জীবন চলার পথকে করে তোলে অর্থময় ও সহজবোধ্য। মরমিবাদের সাথে সুফিবাদের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রগাঢ় এবং এ দুটোর বৈশিষ্ট্যসমূহ মূলত মরমি ও সুফি সাধকগণের মাঝেই পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের জীবনাচরণ, কর্মকাণ্ড, স্রষ্টার অস্তিত্বের সাথে লীন হয়ে থাকার যে কর্মপ্রয়াস; তা সবই মরমি বা সুফি ভাবধারার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মূলত এটাই সত্য যে, এ ঘরানার মানুষের জীবন ও দর্শনবোধে যে যে বিষয় সম্পৃক্ত, অর্থ্যাৎ তাঁদের জীবনাচরণে যে কর্মকাণ্ডগুলো পরিলক্ষিত হয় সেগুলোই মরমি বা সুফি ভাবধারার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। জালালুদ্দিন রুমির জীবনী, সাহিত্যকর্ম ও দর্শন পর্যালোচনা করলে এ সকল বৈশিষ্ট্যাবলি পাঠক ও গবেষকগণের দৃষ্টিগোচর হয়। যা মানব সমাজের কাছে হয়ে উঠেছে অনুকরনীয়। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যাঙ্গণের প্রতিটি কোণায় রুমির মাসনাভির প্রেমময় সুর এক মোহনীয় আবহ সৃষ্টি করেছে।

মাসনাভির নারী চরিত্রগুলোর নানাদিক পর্যালোচনার মাধ্যমে নারীর স্বরূপ মূল্যায়ন করা যায়। স্রষ্টার গুণাবলির ছোঁয়া যে নারীর মাঝে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নারী কেন্দ্রিক গল্পগুলো পাঠ করলেই পাঠকের মানসপটে তা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। ফারসি সাহিত্যের খ্যাতনামা সুফি কবি যেমন; হাফিয, সাদি, ফেরদৌসি, শাহরিয়ার প্রমুখ তাঁদের কাব্যসম্ভারে কোন না কোনভাবে নারীর অবস্থান ফুটিয়ে তুলেছেন।

মাসনাভির মূলতত্ত্ব মূলত কোরআন- হাদিসের নির্যাস। এর সাথে মাওলানা রুমি নিজস্ব সজ্ঞা মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন এক অনবদ্য সাহিত্য, যা এতদঞ্চলে মাসনাভি শরিফ নামে প্রসিদ্ধ। মাসনাভিতে আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্রগুলোর বিশ্লেষণ করাই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

Abstract:

The ultimate theme of mysticism is to acquire earthen and spiritual affectionate feelings, gathering the earnest vicinity of the Almighty. Sufis are capable to establish both perceptible and imperceptible nexus with the creator. It is evolving through mystical literature which is felicitated greatly in the civil society. Mawlana Jalaluddin Rumi is a famous name in the spiritual world. His spiritual thought contributes a lot in Persian literature.

Jalaluddin Rumi's couplet poem is famous as Mathnavi. There are twenty six thousand lines and the basic extract of all those lines has been taken from the Holy Quran and Hadith. The stories of Mathnavi help people to maintain their way of life and make the life style simple and meaningful. The connection between mysticism and spiritualism is so deep and the characteristics of this two are seen in the lifestyle of mystics and Sufis. Their lifestyle, activities, the endeavor of delitescence with the Almighty's existence all are connected inseparably with mysticism and spiritualism. Basically their life, works, philosophy are deeply attached with the characteristics of Sufism. Jalaluddin Rumi's life, literary works and philosophical thoughts are based on spiritualism. In the literary sector of eastern and western society, Rumi's melodious Mathnavi spreads its aroma. We can assess the position of women in our society through the observation of the female characters of Rumi's Mathnavi. There is no doubt Almighty creates women with all his noble qualities. It is being clear when we read the stories based on female characters of Mathnavi. The famous Persian poets such as- Hafiz, Sadi, Ferdousi, Shahriar all of them includes women in their literary works like Rumi.

Mathnavi's fundamental principle is the essence of the Holy Quran and Hadith. Mawlana Rumi creates an impeccable literature with his wisdom and knowledge which is famous in our subcontinent as Mathnavi Sharif. The main theme of this research is to assess the significant female characters of Mathnavi.

সূচিপত্র

ভূমিকা **১১-১৩**

প্রথম অধ্যায়ঃ ফারসি সাহিত্যে মরমিবাদ **১৪-২৭**

১ম পরিচ্ছেদ – মরমিবাদের পরিচয়
২য় পরিচ্ছেদ – মরমিবাদ ও সুফিবাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য
৩য় পরিচ্ছেদ – উপমহাদেশে পারস্য সুফিবাদের প্রভাব
তথ্যসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায় : মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির সংক্ষিপ্ত জীবনী, অধ্যাত্মচর্চা ও সাহিত্যকর্ম **২৮-৫৫**

১ম পরিচ্ছেদ – রুমির সংক্ষিপ্ত জীবনী
২য় পরিচ্ছেদ – অধ্যাত্মচর্চা
৩য় পরিচ্ছেদ – সাহিত্যকর্ম
তথ্যসূত্র

তৃতীয় অধ্যায়ঃ স্রষ্টা ও সৃষ্টির পারস্পারিক প্রেমাকর্ষণ ও রুমির প্রেমতত্ত্ব **৫৬-৬৮**

১ম পরিচ্ছেদ – স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যবর্তী প্রেমাকর্ষণ ও তার স্বরূপ বিশ্লেষণ
২য় পরিচ্ছেদ – রুমির প্রেমতত্ত্ব
তথ্যসূত্র

চতুর্থ অধ্যায় : মাসনাভি পরিচিতি **৬৯-১০২**

১ম পরিচ্ছেদ – দ্বিপদী কাব্য মাসনাভির পরিচয়, উৎস, প্রেক্ষাপট, বিষয়বস্তু
২য় পরিচ্ছেদ – মাসনাভির সামাজিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি
৩য় পরিচ্ছেদ – সাহিত্যের মানদণ্ডে মাসনাভির অবস্থান
৪র্থ পরিচ্ছেদ – মাসনাভির গ্রহণযোগ্যতা, গুরুত্ব ও প্রভাব
তথ্যসূত্র

পঞ্চম অধ্যায় : মাসনাভিতে চিত্রিত নারী চরিত্র **১০৩-১৪৭**

১ম পরিচ্ছেদ – যুগ পরিক্রমায় নারীর অবস্থান
২য় পরিচ্ছেদ – ফারসি সুফি কবিদের সাহিত্যে নারী
৩য় পরিচ্ছেদ – মাসনাভিতে নারীর অবস্থান ও চরিত্র বিশ্লেষণ
তথ্যসূত্র

উপসংহার **১৪৮**

ভূমিকা

সাহিত্য এমন এক মাধ্যম, যা শৈল্পিক ভঙ্গিতে সমাজের প্রকৃত রূপ ফুটিয়ে তোলে। মানব জীবনে সাহিত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সাহিত্যের প্রভাব প্রকাশ না পেলেও মানুষের মননে এর প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। সাহিত্য সমাজের দর্পণ স্বরূপ। সাহিত্যের রয়েছে নানা ধরণ- ধারণ। শব্দের ছন্দবদ্ধ গাঁথুনি, চিত্রকল্প, উপমা- উৎপ্রেক্ষার যথাযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কোনো ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও কল্পনার মিশেলে সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রাণহীন শব্দমালা সাহিত্যের মোড়কে নবরূপে সজ্জিত হয়ে ওঠে। সমাজের মানুষের কাছে পৌছে দেয় নতুন কোনো বার্তা।

আদিকাল থেকেই সাহিত্যের সূচনা। প্রাচীন পারস্য নগরী সাহিত্যের এক উর্বর ভূমি। যে ভূমিতে জন্মেছেন কালজয়ী কবি- সাহিত্যিকেরা। পারস্য নগরী তথা বর্তমান ইরানের রাষ্ট্রীয় ভাষা ফারসি। আর এ মিসরির ন্যায় মিষ্টি ভাষায় রচিত হয়েছে বিশ্বনন্দিত সব সাহিত্যকর্ম। আত্তার, জামি, সাদি, হাফিয, ফেরদৌসি, নিজামি, খৈয়াম, রুমি ফারসি সাহিত্যের বহুল পরিচিত নাম। তাঁদের হাত ধরেই ফারসি সাহিত্য বিশ্ব দরবারে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় প্রস্ফুটিত হয়েছে। জাগতিক ও ধর্মীয় নানা বিষয়ে তাঁরা লিখেছেন সাহিত্যের অমীয় বাণী। যা মানব চিত্তে তৈরি করেছে ব্যাপক আলোড়ন। খ্যাতনামা কবিগণ সাহিত্যের আদলে গড়েছেন আধ্যাত্মিক আবহ, যা সাধারণ পাঠকের মনে স্রষ্টার আলোকচ্ছটা বিকিরণ করে। তাদের মানসপটে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভূত হতে থাকে। যে সাহিত্য পাঠ করলে পাঠকের হৃদয়ে পরমাত্মার ছোঁয়া অনুভূত হয়, তাকে বলা হয় আধ্যাত্মিক বা সুফি সাহিত্য।

ফারসি সুফি বা মরমি সাহিত্যের আলোকবর্তিকা হলেন আবু সাঈদ আবুল খায়ের। তাঁরই ধারাবাহিকতায় কালক্রমে বয়ে চলেছে এ স্রোতধারা। আধ্যাত্মিক এ স্রোতে অবগাহনের মাধ্যমে মানব মনে স্রষ্টার অস্তিত্ব ফুটে ওঠে। পার্থিব লোভ- লালসা ত্যাগ করে মানুষ স্রষ্টায় বিলীন হতে চায়। জাতি- ধর্ম- বর্ণ- গোত্র নির্বিশেষে সকল কিছুর উর্দ্ধে উঠে যান একজন আধ্যাত্মিক সাধক। স্রষ্টার ধ্যানে মগ্ন হয়ে কাটিয়ে দেন পুরোটা জীবন। ফানাফিল্লাহ- বাকাবিল্লাহর হাত ধরে তাঁরা হয়ে ওঠেন অন্য এক সত্ত্বা। যে সত্ত্বা শুধু স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়। অধ্যাত্মবাদ মানুষের অন্তরকে পার্থিব পঙ্কিলতা থেকে পরিচ্ছন্ন করে।

মহান স্রষ্টা আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন মানব জাতিকে। হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) হলেন আমাদের আদি পিতা- মাতা। সৃষ্টির সূচনালগ্নেই স্রষ্টা পুরুষের সাথে নারীকে সৃষ্টি করেছেন। কেননা দু'জন একে অপরকে ছাড়া অসম্পূর্ণ। মানব সভ্যতার আদিপর্ব হতেই জীবন সংগ্রামে, সভ্যতার উন্নয়ন ও বিকাশে পুরুষের পাশাপাশি নারীরও সমান অবদান রয়েছে। নারী মানব সমাজের অর্ধাংশ। স্রষ্টার গুণাবলির স্পষ্ট ছাপ রয়েছে নারী জাতির মাঝে। নারীর চিন্তা- চেতনা, মানবিক গুণাবলি এবং সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সমাজে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে আজও তারা পিছিয়ে আছে। তাদের এই পশ্চাৎপদতা সমাজের সার্বিক উন্নয়নকে বিঘ্নিত করে। সামাজিক উন্নয়নকে তরান্বিত করতে আমাদের নারী সমাজকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নজরুলের ভাষায় –

'' বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।"

(সঞ্চিতা, কাজী নজরুল ইসলাম)

ফারসি সাহিত্যের এক অনবদ্য গ্রন্থের নাম মাসনাভিয়ে মানাভি। মাসনাভি বলতে সর্বাগ্রে মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি রচিত মাসনাভি শরিফের কথাই স্মরণ হয়। কোরআন- হাদিসের সারবস্তু এবং রুমির সাহিত্যিক স্বকীয়তার মিশেলে রচিত হয়েছে মাসনাভি কাব্যসম্ভার। এতে রয়েছে সামাজিক - ধর্মীয় নানা বিষয়ের শিক্ষা, রয়েছে সমাজের নারী চরিত্রের নানামুখী গল্প। স্রষ্টার সৃষ্ট নারী জাতির মাঝে রয়েছে ভিন্নতা। একেক জন নারী একেক বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত।

ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে পঠিত বিষয়ের মধ্যে মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির জীবনাদর্শ ও সাহিত্যকর্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রুমি ও মাসনাভি পাঠের মাধ্যমে এ বিষয়ের প্রতি আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. নূরুল হুদা স্যার, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শাহজালাল স্যার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন স্যার, ড. ঈসা শাহেদী স্যার মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি ও তার মাসনাভি নিয়ে এম.ফিল ও পিএইচডি অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন। লিখেছেন বিভিন্ন বই ও গবেষণা প্রবন্ধ। বিভাগীয় ছাত্র থাকাকালীন রুমি ও তাঁর মাসনাভির প্রতি আমার কিছুটা আগ্রহ তৈরি হয়। যেহেতু আমি একজন নারী, তাই আমার এম.ফিল গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছি মাসনাভিতে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্রগুলোর ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ।

অভিসন্দর্ভের একাংশে ফারসি মরমি ভাবধারার সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি- সাহিত্যিকের কিছু কবিতা-সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; যা মূলত নারী কেন্দ্রিক। আর সে সকল সাহিত্যে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া। আমি আমার গবেষণাকর্ম ফারসি মরমি সাহিত্যে নারী: পরিপ্রেক্ষিত মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির মাসনাভি (Women in Persian Mystic Literature :The Perspective of Jalaluddin Rumi's Mathnavi) নির্ধারণ করেছি।

মাসনাভিতে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্রগুলোর বিশ্লেষণ করাই আমার গবেষণার উদ্দেশ্য। গবেষণা কর্মটি আলোচনার সুবিধার্থে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রয়োজনীয় নামকরণের মাধ্যমে স্বতন্ত্র করা হয়েছে। সেই সাথে সংযোজিত হয়েছে ভূমিকা ও উপসংহার। বানানের ক্ষেত্রে আমি প্রচলিত বানান রীতি অর্থ্যাৎ বাংলা একাডেমি, ঢাকা কর্তৃক প্রবর্তিত ব্যবহারিক বাংলা অভিধান এর বানান রীতি অনুযায়ী আমি আমার গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেছি। মাসনাভির ফারসি অংশের বঙ্গানুবাদ যেগুলো আমি নিজে করেছি, সেগুলোতে তথ্যসূত্র দেয়া হয়নি। মূল অধ্যায়গুলোর সারৎসার ভূমিকার শেষাংশে পেশ করা হলো:

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম: ফারসি সাহিত্যে মরমিবাদ। এ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়কে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। মরমিবাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে প্রথম পরিচ্ছেদে। তারপর মরমিবাদ ও সুফিবাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উপমহাদেশে পারস্য সুফিবাদের প্রভাব আলোচিত হয়েছে এ অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম: মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির সংক্ষিপ্ত জীবনী, অধ্যাত্মচর্চা ও সাহিত্যকর্ম। এ অধ্যায়টিতেও রয়েছে তিনটি পরিচ্ছেদ। পর্যায়ক্রমে পরিচ্ছেদগুলো আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম: স্রষ্টা ও সৃষ্টির পারস্পারিক প্রেমাকর্ষণ ও রুমির প্রেমতত্ত্ব। এই অধ্যায়ে রয়েছে দু'টি পরিচ্ছেদ। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যবর্তী প্রেমময় সম্পর্ক কীরূপ হয় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে রুমির বিশ্বনন্দিত প্রেমতত্ত্বেরও আলোচনা উঠে এসেছে এ অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম: মাসনাভি পরিচিতি। দ্বিপদী কাব্য মাসনাভির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এ অধ্যায়ে। এতে রয়েছে চারটি পরিচ্ছেদ। সাহিত্যিক মানদণ্ডে মাসনাভির অবস্থান ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম: মাসনাভিতে চিত্রিত নারী চরিত্র। এ অধ্যায়ে রয়েছে তিনটি পরিচ্ছেদ। যুগ পরিক্রমায় নারীর অবস্থান, ফারসি সুফি কবিদের সাহিত্যে নারীর অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে, মাসনাভিতে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য নারী কেন্দ্রিক গল্পগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করার মাধ্যমে ঐ নারী চরিত্রগুলোর পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

প্রথম অধ্যায়

ফারসি সাহিত্যে মরমিবাদ

১ম পরিচ্ছেদ - মরমিবাদের পরিচয়

২য় পরিচ্ছেদ - মরমিবাদ ও সুফিবাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য

৩য় পরিচ্ছেদ - উপমহাদেশে পারস্য সুফিবাদের প্রভাব

১ম পরিচ্ছেদ

মরমিবাদের পরিচয়

মানবজীবনের গূঢ় রহস্যের মূলতত্ত্ব হল পার্থিব ও আধ্যাত্মিক প্রেমানুভূতি অর্জনের মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করা। সাহিত্যে মরমিবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এই মতবাদকে হৃদয় দ্বারা অনুভব করতে হয়; নতুবা এর পরিপূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভব নয়। সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে আজ অবধি পৃথিবীতে এই পবিত্র অনুভূতিটি চিরন্তন হয়ে আছে। সৃষ্টিকর্তা তাঁর অপার ভালবাসায় সৃষ্টি করেছেন গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। স্রষ্টার ভালবাসার কিছু অংশ ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র সৃষ্টি জগতে। আর তাই পৃথিবীতে প্রত্যেকটি জীব মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। সৃষ্টিকর্তার সাথে সৃষ্ট জগতের এই মায়াময় বন্ধন; পৃথিবীকে করে তুলেছে প্রেমময়। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে। তাই মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ গুণগুলো বিরাজমান। স্রষ্টা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন বুদ্ধি বিবেক ও কোমল হৃদয়ের সংমিশ্রণে। অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে স্রষ্টাকে অনুভব করতে পারার যে অনুভূতি তাই মরমিবাদ। আর যিনি স্রষ্টার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংযোগ স্থাপনে সক্ষম তিনিই মরমি। একজন মরমি জীব জগতের মাঝে স্রষ্টার উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন। সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মরমিবাদ, সুফিবাদ, অধ্যাত্মবাদ এই শব্দগুলো মূলত সমার্থক। স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করার যে পবিত্র অনুভূতি মানব হৃদয়ে অনুভূত হয়, সেটাই মূলত মরমিবাদ।

ইংরেজি Mysticism "মিস্টিসিজম" শব্দটির অভিধানিক অর্থ হলো অতিন্দ্রিয়বাদ বা মরমিবাদ। অতিন্দ্রিয়বাদ হচ্ছে এমন এক গুঢ়তত্ত্ব, যা স্রষ্টা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্থ্যাৎ তাঁর অস্তিত্ব সর্বত্র বিরাজমান সেই বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি জাগায়। আধ্যাত্মিক ও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়গুলো যাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন, তাঁরা হলেন মরমিয়া। তাঁরা মর্ম উপলব্ধিকারি, সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। ইংরেজি Mystic শব্দের প্রতিরূপ হচ্ছে মরমি।

মানুষ অনন্তকাল ধরে অসীমের প্রতি অনুরক্ত থেকে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তির পথ খুঁজে চলেছে। নানা মত ও পথের অনুসারী হয়ে এক শ্রেণির মানুষ আজও মরমিবাদের ধারাটিকে প্রবাহিত রেখেছেন। এদের কেউ বাউল, বয়াতি আবার কেউবা বৈষ্ণব ফকির হিসেবে আখ্যায়িত।

বাংলা ভাষায় মরমি সাহিত্যের উপাদান খুঁজে পেতে হলে দৃষ্টি দিতে হবে বাঙ্গালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত নানা লোকগাঁথা, বাউল গান, কীর্তন ও জারি-সারি গানের দিকে। কেননা এগুলোর মাঝে গ্রোথিত রয়েছে আধ্যাত্মিক গুঢ়রহস্য; যা মরমিবাদের মূলকথা।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম যেমন: ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, ইহুদি প্রত্যেকটিতে অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধীয় চর্চা অধ্যাবধি চলে আসছে। মত, পথ ও পদ্ধতি ভিন্ন হলেও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক। আর এই

অতীন্দ্রিয়বাদের প্রভাব বিশ্বের প্রচলিত সব ভাষার সাহিত্যে; বিশেষ করে কবিতা ও গানে অত্যন্ত উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান।

ইংরেজি সাহিত্যের মহাকবি দান্তের *'ডিভাইন কমেডি'* বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রূপক কাব্য। মানবাত্মা কর্তৃক পরমাত্মার সন্ধান লাভই হলো এ কাব্যের উপজীব্য বিষয়। শেক্সপিয়র তাঁর নাটকে জীবনের রহস্য অনুধাবন করতে চেয়েছেন। তাঁর *ম্যাকবেথ* নাটকের নায়ক জীবনের সব দ্বন্দ্ব সংঘাতের অন্তিম মূহূর্তে জীবনের অসারতার বাণী উচ্চারণ করেছেন। কবি পি.বি শেলীর *স্কাইলার্ক* এ কল্পনার গতি উদ্দাম হওয়া সত্ত্বেও এক সময় তা অনন্তে ধাবমান হয়েছে। অমর শিল্পী বিটোফেনের সৃষ্ট সুরেও রয়েছে একই তন্ময়তা। উর্দু সাহিত্যের মহান কবি মির্জা গালিবের কবিতায় এসেছে-

"হাম কাঁহা হোতে, আগার হুসন না হো খুদভি" অর্থ্যাৎ আমরা কোথায় থাকতাম যদি রূপ আত্মদর্শী না হতো।

জার্মান সাহিত্যের প্রাণপুরুষ গ্যাটে, রাশিয়ান কবি পুশকিন ও উর্দু সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি আল্লামা ইকবালের জীবন সম্পর্কে প্রায় একই জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা মূলত অতীন্দ্রিয়বাদের মূলকথা।

আধুনিক বাংলা কাব্য ধারায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বিহারিলাল মজুমদার, জসীম উদ্দীন, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ এই অতীন্দ্রিয়বাদের চেতনা দ্বারাই প্রভাবিত।

বিশ্বের প্রায় সব ধর্মের সাধকগণ তাঁদের নিজেদের মনে "আমি কে" প্রশ্নটি করেছেন এবং এর জবাবে "স্রষ্টাই সব" এই ধারণাটিই উপলব্ধি করেছেন। স্রষ্টা থেকে ব্যক্তি আমি পৃথক নয়। তাঁর থেকে পৃথক কোন কিছুরই কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু স্রষ্টাকে দেখার মত অর্ন্তদৃষ্টি সাধারণের নেই বলেই মানুষের আত্মার এই সীমাহীন বেদনা ও অবিরাম ক্রন্দন। মানুষের মাঝে আমিত্ব বোধ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই আমি অতি ক্ষুদ্র, বস্তুনির্ভর ও অতৃপ্ত। এই আমি চেতনা থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টাই হলো মরমিবাদের একমাত্র লক্ষ্য। এ কারণেই বলা হয়েছে-

من عرف نفسه فقد عرف ربه

"মান আরাফা নাফসাহু ফাক্বাদ আরাফা রাব্বাহু"

যে নিজেকে চিনেছে, সে তার প্রভুকেও চিনেছে। (http://hadith.net/post/1942/)

ভারতীয় চিন্তা দর্শনের মহানায়ক স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি- "আত্মনং বিদ্ধি" অর্থ্যাৎ নিজেকে জানো। গৌতম বুদ্ধও এই একই সুরে উচ্চারণ করেছেন- "বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি" অর্থাৎ প্রভুর স্মরণেই নির্বাণ।

মরমি সাধকগণ চোখ বন্ধ করে নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর চিন্তা-তন্ময়তার মাধ্যমে সত্য ও সুন্দরকে উপলব্ধি করতে পারেন। এই প্রয়াসে তাঁদের প্রজ্ঞা ও ভাবাবেগের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটে। আর এ সমস্ত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে নানা রূপক ও উপমার মাধ্যমে। এই সহজ তত্ত্ব একমাত্র বিশুদ্ধ প্রেম দ্বারাই উপলব্ধি করা সম্ভব।

বাংলার আউল, বাউল, মারফতি ও মুর্শিদী গানের মাঝে নানা হেঁয়ালি কথায় রয়েছে মরমিবাদের ছোঁয়া। এই ধারা চর্যাপদ, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলি থেকে শুরু করে রবীন্দ্র নজরুলের সাহিত্যেও চলে এসেছে। (dailynayadiganta, 31 July 2020)

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা সুফিতত্ত্বকে আশ্রয় করে উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছে। "হৃদয়ে তোমার চলে যেন আলিফের খেলা" এটিই সুফিতত্ত্বের মর্মকথা। অর্থ্যাৎ মানব হৃদয়ে যেন সর্বদা আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভূত হতে থাকে। প্রেম ও ভক্তি দ্বারা আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমেই কেবল তাঁকে (আল্লাহকে) পাওয়া যায়। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও তাঁর মাঝে নিজেকে বিলীন করে দেওয়াই সুফি সাধকের চরম লক্ষ্য। সুফি আর মরমিবাদের পথে হেঁটেই মানুষ স্রষ্টার সান্নিধ্য পেতে চায়।

মরমি কবি হাসন রাজা, লালন শাহ, কাঙ্গাল হরিনাথ, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, গগন হরকরা প্রমুখের গানে মরমি অনুভূতির গভীরমত প্রকাশ ঘটেছে। গগন হরকরার গানের ভাষায়-

"আমি কোথায় পাব তারে।

আমার মনের মানুষ যে রে।"

লালন শাহ ও হাসন রাজার সাহিত্যকর্ম সাধারণের মাঝে স্রষ্টা ও সৃষ্টির চিরন্তন রহস্য উদঘাটনে প্রয়াসী বাউল সঙ্গীত নামে প্রসিদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে মরমিবাদের মজবুত ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁদের সাহিত্য ভাণ্ডারের অবদান অসামান্য। লালনের গানের প্রতিটি কলিতে ভেসে ওঠে অসাম্প্রদায়িকতার সুর। তাঁর গান বাংলার হিন্দু মুসলিমের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয়।

লালনের ভাষায়-

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়,"

তাঁর গানের এই অচিন পাখি হল মানব শরীরের রুহ বা আত্মা। যা স্রষ্টার আদেশে যাওয়া-আসা করে। যেই পাখিকে কোন শৃঙ্খল বা বেড়িতে আবদ্ধ করা যায় না।

তাঁর অন্য একটি গান-

"বাড়ির পাশে আরশি নগর

সেথা এক পড়শি বসত করে।”

এই গানের মূলভাব হলো মানুষ আমৃত্যু নিজেকে চেনার এবং নিজের মনোজগতে (আরশি নগর) অবস্থানকারী পরমপ্রিয় স্রষ্টাকে অন্বেষণের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে।

হাসন রাজার গানের সুরেও আছে ঐশী প্রেমের ছোঁয়া। তাঁর রচিত গান-

মাটিরো পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়া রে

কান্দে হাসন রাজার মন ময়না রে।

এ গানের কথায় স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে যে, মানবাত্মা মানব শরীর থেকে মুক্ত হয়ে সেই পরমাত্মার সাথে মিলিত হতে সদা ব্যাকুল থাকে। মাটির পিঞ্জিরা (মাটি হতে তৈরি মানব দেহাবয়ব) এবং ময়না (মানবাত্মা) রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

হাসন ও লালনের গানের মাঝে প্রেম ও বৈরাগ্যময় আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। কেননা তাঁরা উভয়েই বাংলায় আগমনকারি ফারসি ভাষী সুফিগণ কর্তৃক আচরিত ও প্রচারিত ইসলামি অধ্যাত্মবাদ বা তাসাউফ থেকে সৃষ্ট বাউল ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন।

ফারসি সাহিত্যের কবিগণ তাঁদের সাহিত্যের মাঝে ফুটিয়ে তোলেন আধ্যাত্মিক বা মরমি ভাবধারা। তাঁদের রচিত মরমি সাহিত্যে সৃষ্টিকর্তার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংযোগ স্থাপনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। Mysticism বা মরমিবাদের পরিসর অনেক বিস্তৃত। কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রুপে মরমিবাদের আবির্ভাব হয়েছে। যুগে যুগে এমন গোষ্ঠী বা মানুষের সন্ধান মিলেছে যাঁরা ছিলেন অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে বিশ্বাসী এবং আত্মবিলীনের মাধ্যমে পরমাত্মার সাথে সম্মিলনে প্রয়াসী। এই ভাবধারাটি মরমিসাধক ও সুফিগণের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী মরমিবাদ মূলত সুফিবাদ নামেই পরিচিত। (হালিম, ১৯৯৮: ৯৫)

২য় পরিচ্ছেদ

মরমিবাদ ও সুফিবাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য

ইসলামী পরিভাষায় সুফিবাদকে তাসাউফ বলা হয়। তাসাউফ হল আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান। সুফিবাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা।

সুফি শব্দটি নানা উৎস হতে উৎপন্ন হয়েছে। সুফ (صوف) থেকে সুফি শব্দটি এসেছে। যার অর্থ পশম। যারা পশমী পোশাক পরিধান করেন, তাঁরাই সুফি। দুনিয়াবি ভোগ বিলাস ত্যাগের প্রতীক হিসেবে সুফিগণ পশমী পোশাক পরিধান করেন।

মাওলানা আব্দুর রহমান জামি ও তাঁর অনুসারিগণের মতে, সুফি শব্দটি আরবি 'সাফা (صافة) হতে উৎপন্ন। যার অর্থ পবিত্রতা। যারা পার্থিব পাপ হতে মুক্ত ও পবিত্র, তাঁরাই সুফি। (সরকার, ১৯৮৪ ঃ ২)

নবী কারীম স. বলেন-

الا و ان فى الجسد مضغة اذا ملحت ملح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب

মানবদেহে একটি বিশেষ অঙ্গ আছে, যা সুস্থ থাকলে সমগ্র দেহ পরিশুদ্ধ থাকে, আর অসুস্থ হলে সমগ্র দেহ অপরিশুদ্ধ হয়ে যায়। জেনে রাখো এটি হলো কলব্ বা হৃদয়।" (ইসমাঈল,তা.বি: ১৩)

ইসলামি দুনিয়ায় আধ্যাত্মিকতা মূলত সুফিদের সাথে সম্পৃক্ত। তবে অন্যান্য ধর্ম ও গোষ্ঠীর মধ্যে এর নানাবিধ নাম প্রচলিত আছে। তাসাউফ হচ্ছে আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার সমন্ধয়; তবে যুগের পরিক্রমায় বিভিন্ন স্থানে এই চিন্তাধারার তারতম্য ঘটে থাকে। তবে সকল চিন্তাধারায় একটি বিষয় মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত। আর তা হচ্ছে আত্মার পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে পরমাত্মার সাথে মিলিত হওয়া। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর ওপর নাযিলকৃত পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন। কুরআনে বর্ণিত নির্দেশনা, হাদিসে প্রদর্শিত কর্মপন্থা ও রাসূলে কারিম সা. কর্তৃক প্রচারিত জীবন বিধানই ইসলামে মরমিবাদ হিসেবে পরিচিত। কুরআনে বর্ণিত দিকনির্দেশনা ও হাদিসে উল্লিখিত বাণীর গভীরতম অর্থের উপর ভিত্তি করে ইসলামে সুফিবাদের উদ্ভব ঘটে। নবী কারিম সা. থেকেই মূলত তাসাউফ বা সুফিবাদের সূচনা। কেননা সুফিবাদের মূল বিষয়গুলো কুরআন ও হাদিসেরই নির্যাস। তবে কিছু কিছু ইউরোপীয় গবেষক মনে করেন, তাসাউফ বা সুফিবাদের বিষয়টি মূলত যরথুস্ত্রীয় ধর্মের অন্তর্গত। অনেকে মনে করেন যে, হিন্দুদের যোগ- সাধনা বা খ্রিষ্টধর্মের সন্ন্যাসবাদ, বৈষ্ণব ধর্ম বা ইয়াহুদি ধর্মের আদর্শ থেকে সুফিবাদের মূল উৎস উৎসারিত হয়েছে। তবে আসল বিষয় হচ্ছে যে, এই সমস্ত চিন্তাধারা ও মতবাদের আকিদা বা বিশ্বাসের সাথে সুফিবাদের বাহ্যিক বা চৈন্তিক যতই সাদৃশ্য থাকুক না কেনো, ইসলামী সুফিবাদের মূল উৎস হচ্ছে কুরআন, হাদিস ও ইসলাম । (তামিমদারি, ২০০৭: ১৮)

সুফিবাদ সুপ্রাচীন এক ধর্মীয় অধ্যাত্ম রহস্যের বিশ্বাস। সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই সুফিবাদ নানা মত ও পথের অনুসারী। সুফিগণের উপলব্ধ নানা তত্ত্ব শিষ্য পরম্পরায় বিকশিত হয়েছে। আবার কখনো বিকৃত রূপ লাভ করেছে। আর এরই ফলে যুগে যুগে নানা সুফি মতাদর্শের উদ্ভব ঘটেছে। মরমি সাধকগণ তাঁদের তত্ত্বকথায় ফুটিয়ে তোলেন মানবতত্ত্ব; যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ- সব কিছুরই ঊর্দ্ধে। সুফিতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবাদ যেমন মরমিবাদের সাথে সম্পৃক্ত; ঠিক তেমনি বাউল ও বৈষ্ণব তত্ত্বও মরমিবাদের অর্ন্তগত। এই প্রত্যেকটি বিষয়ই গভীর তত্ত্বভিত্তিক এবং স্বতন্ত্র দার্শনিক বলয়ে আবদ্ধ। এর প্রত্যেকটি শাখাই রূপক, উপমা, প্রতীক, উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে নিজস্ব দর্শন উপস্থাপন করে থাকে। তবে বাহ্যিক বৈশাদৃশ্য থাকলেও এই শাখাগুলোর মূল দর্শন হচ্ছে "স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা" কেবল হৃদয় নিসৃত প্রেম দিয়েই স্রষ্টাকে পাওয়া যায় আর প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টা প্রাপ্তির এ আরাধনাই মূলত মরমি সাধনা । ইসলামের সুফিতত্ত্ব , বাংলার বাউল তত্ত্ব ও ভারতীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব অনেকটা এই পদ্ধতির অনুসারী।

মরমি ও সুফি সমার্থবোধক হলেও এর মধ্যে ভাবাবেগের সামান্যতম তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সুফি শব্দটির রয়েছে সীমিত ব্যবহার ও একটি বিশেষ ধর্মীয় তাৎপর্য। এছাড়াও সুফি হচ্ছেন ঐ সমস্ত মরমি সাধক; যাঁরা ইসলামের অনুসারী। (হক,২০০১: ১৯৯-২০০) তবে বর্তমান সময়ে কিছু সুফি সাধক ইসলামি চিন্তাধারার সাথে অন্য বিষয়গুলোর সমন্বয় ঘটিয়ে এক নতুন ধারা প্রবর্তনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

ইসলাম থেকেই সুফিবাদের উদ্ভব। আর তাই ইসলামই সুফিবাদের মূলভিত্তি। কিছু পাশ্চাত্য গবেষক মতামত দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআনই সুফিতত্ত্বের মূল ও শ্রেষ্ঠ উৎস।(রহমান,১৯৮৪: ১৭৬)

সুফিমতের উদ্ভব নিয়ে রয়েছে নানা মুনির নানা মত। Von kremer ও Dozy এর মতানুসারে, ইরানে সুফিবাদের উন্মেষ ঘটেছে বেদান্তের প্রভাবে। বিখ্যাত ব্রিটিশ গবেষক E.G.Browne বলেছেন, ইরানের ভাবালু আর্য মনে বাস্তব বাদী শামীয় (Semitic) অরবধর্ম কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াই পরবর্তীতে সুফিতত্ত্বে রূপা পরিগ্রহ করেছে। অপরদিকে Merx ও R.A. Nicholson এর ধারণা মতে, সুফিমতের উদ্ভব ঘটেছে নব্যপ্লেটোবাদ থেকে। এছাড়া বলা হয়ে থাকে যে, মানি, মাজদাকি, বাইবেল ও কুরআনিক তত্ত্ব মিশ্রিত মতবাদই হচ্ছে সুফিবাদ।(শরীফ, ২০১০: ৩৯)

সুফিগণ বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেকটি জাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে একজন নবি এসেছেন। তাঁদের মাঝে রয়েছে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। আর এই জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে আত্মস্থ করার কোনো বিকল্প নেই। (ঝা,২০১৯:৪২)

কুরআনের একটি আয়াতে এসেছে,

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

যেহেতু আমরা তোমাদের মধ্যে থেকেই তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে অহি (আল্লাহর বাণী) পাঠ করেন, তোমাদের পবিত্র করেন, তোমাদেরকে অহির শিক্ষা ও প্রজ্ঞা দান করেন এবং যা তোমরা আগে জানতে না, তা জানিয়ে দেন। (সুরা: বাক্বারা, আয়াত: ১৫১)

পবিত্র কুরআনের এ ধরনের আয়াতের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার উপরই সুফিবাদের ইসলামিরূপ প্রতিষ্ঠিত।

কুরআন ও হাদিসের নির্যাস ছাড়াও আরও বেশকিছু বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সুফিমত টিকে আছে। যোগসাধনা, বৈষ্ণবমত, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, বাউলতত্ত্ব, দেহতত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটেছে সুফিবাদের সাথে। কামরূপের ভোজ বর্মণ রচিত অমৃতকুণ্ড এর আরবি-ফারসি অনুবাদের মাধ্যমে মুসলিম সুফিগণ যোগসাধনার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই অনূদিত গ্রন্থের মাধ্যমে মুসলিম সুফি সমাজে যোগতত্ত্বের বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। (রহিম, ১৯৮২: ৩৯৫)

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কিছু অংশ ইসলাম গ্রহণ করেন আর কিছু গ্রহণ করেন হিন্দুধর্ম। এই দুই পর্যায়ভুক্ত মানুষের মাঝে স্বভাবতই বৌদ্ধ ঐতিহ্যের উপাদানগুলোর সমন্বয় ঘটেছিল। এ কারণেই যুগ পরিক্রমায় হিন্দু মুসলমানের সংমিশ্রণে বাউলমত গড়ে উঠেছে। বৌদ্ধ সহজিয়াদের কাছে পরম সত্য হচ্ছে প্রেম। তাদের মতে, জীবন ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুর সহজ স্বরূপ হচ্ছে প্রেম। বৈষ্ণব মতের অর্থাৎ চৈতন্য চরিতামৃতের প্রভাব এবং সুফিমতের অর্থাৎ কলন্দরিয়া (মধ্য এশিয়ায় অর্থ্যাৎ ইরানে উদ্ভূত সুফি তরিকার প্রতিষ্ঠাতা স্পেনের অধিবাসি ইউসুফ কলন্দরিয়া) (বাংলাপিডিয়া, ৫ মে, ২০১৪) সম্প্রদায়ের প্রভাব অতিমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে, সতেরো শতকের মধ্যভাগ থেকে আনুমানিক (১৬২৫-১৬৭৫) খ্রি. বাউলমতের উদ্ভব ঘটেছে। (চৌধুরী, ২০১৩ : ১৩) বাউলমতে, আত্মা ও পরমাত্মা কোনো ভিন্ন বিষয় নয়; বরং আত্মা পরমাত্মারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুসলিম বাউলেরা নেড়ার ফকির, আউল, সাঁই, হজরতি, দরবেশ প্রভৃতি নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। তাদের মাঝে যোগ সাধনা অর্থাৎ যৌগিক প্রক্রিয়ায় শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিই অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। মুসলিম বাউলেরা সাধারণত ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনের ব্যাপারে খুব একটা সচেতনতা অবলম্বন করেন না। গদবাঁধা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের পরিবর্তে তাঁরা প্রেমকে সার্বজনীন আরাধনার বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বাউলদের কিতাব, কানুন ও শাস্ত্রের প্রতি রয়েছে ব্যাপক অনাস্থা এবং যুক্তি তর্কের মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিষয়টিতেও রয়েছে অনীহা। আর এ সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁদেরকে মরমি বলেই প্রমাণ করে। বাউলমনে যে মরমিশক্তি রয়েছে, তার মাধ্যমেই তাঁরা পরম স্রষ্টাকে উপলব্ধি করে। এ সমস্ত মরমিবাদী বৈশিষ্ট্যের কারণে বলা হয়ে থাকে যে, বাউল সম্প্রদায় সুফিদের দ্বারা প্রভাবিত। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছেন; 'বাউল' শব্দটি 'আউল' শব্দ থেকে উদ্ভুত। তাঁর মতে, 'আউল' শব্দটি আরবি 'আউলিয়া'(ওলির বহুবচন) থেকে এসেছে।

ডক্টর সৈয়দ আবদুল হালিমের মতে, 'আউল' শব্দটি 'আউয়াল' শব্দজ।

ডক্টর এস.এম. লুৎফর রহমান 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন যে, বাজিল, বাজুল, বাজির, বাজ্জিল শব্দগুলো মূলত 'বাউল' শব্দের পূর্বরূপ। এছাড়াও ধারণা করা হয় যে, বজ্রকুল- বজ্জউর-বাজুল-বাউল এই ধারার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে।

সাহিত্য সৃষ্টির উৎস মূলত তিন ধারায় বিভক্ত : ধর্মসাহিত্য, তত্ত্বসাহিত্য ও মরমিয়া সাহিত্য। বাউল গানের কদর গান হিসেবে নয়; বরং তত্ত্বকথার আশ্রয় হিসেবেই অধিক পরিচিত। সুফিবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল পরিলক্ষিত হয় দক্ষিণ ভারতের ভক্তিধর্ম, উত্তর ভারতের সন্তধর্ম এবং বাংলার বৈষ্ণব ও বাউলমতের উপর। বাউলগুরুরা কবি, দার্শনিক, ধর্মবেত্তা ও মরমি হিসেবে সমাজে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। সুতরাং বলা যায় যে, বাউলমত মূলত যোগসাধনা, তন্ত্রসাধনা, সংখ্যসম্ভূত এবং সুফিমতের প্রভাবে উদ্ভুত একটি মতবাদ। (শরীফ, ২০১০ : ৪৯-৬০)

সুফিবাদের ভাষায়, জীবাত্মা পরমাত্মার মাঝে অবস্থিত। আত্মার পরিশুদ্ধির মাঝেই রয়েছে আল্লাহ প্রাপ্তির পথ। এজন্যই বলা হয়েছে - Knoweth Thyself বা আত্মনং বিদ্ধি বা নিজেকে চেন।

আল কুরআনে এসেছে-

و نحن أقرب إليه من حبل الوريد

আল্লাহ মানুষের শাহ্‌রগের চেয়েও নিকটে অবস্থান করেন । (সূরা: ক্বাফ: আয়াত :১৬)

তবে মানুষ তাকে দেখতে না পেলেও অর্ন্তচক্ষু দ্বারা অনুভব করতে পারে। সুফিতত্ত্বের সাথে এদেশের মানুষের সাহিত্যিক পরিচয় ঘটেছে মূলত মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির মাসনাভির মাধ্যমেই। এ গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কবি-সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন ভাষায় স্রষ্টা ও মানুষের সম্পর্ককে বর্ণনা করেছেন।

"I gazed into my own heart there I saw Him, He was nowhere else."

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমনটাই গেয়েছেন -

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে

দেখতে আমি পাইনি।

বাহির পানে চোখ মেলেছি

হৃদয় পানে চাইনি!!

কিংবা,

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে

তাই হেরি তায় সকল খানে।

অন্যভাবে বলা যায় যে,

আমাকে কোথায় খুঁজে বেরাচ্ছ বান্দা?

আমি তো তোমার অতি নিকটে।

না আমি দেবালয়ে, না আমি মসজিদে

না আমি কাবায় না আমি কৈলাসে।

সুফিতত্ত্বে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের চুড়ান্ত অবস্থাকে ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ বলা হয়ে থাকে। এই চুড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হয়ে মনসুর হাল্লাজ (৮৫৮-৯২২ খ্রি.) নিজেকে পরম সত্য ও সত্ত্বা (আনাল হক) বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং অপরদিকে চৈতন্যদেবের "মুই সেই, মুই সেই" (আমি সেই, আমি সেই) বক্তব্য দুটি আপাত দৃষ্টিতে ভাষা ও উচ্চারণগত ভাবে সমার্থক না হলেও ভাবার্থ ও ব্যঞ্জনা অভিন্ন। মরমি সাধনার মধ্যে দিয়েই মরমিবাদের পরিচর্যা করা হয়। বিভিন্ন ধর্মমতকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে মরমি সাধনার নানা পথ উন্মোচিত হয়েছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য সাধনা, নাথ সাধনা, হিন্দু যোগ সাধনা, দেহতত্ত্ব ও ইসলামি সুফি ভাবনা সংমিশ্রিত হয়েই বাংলার মরমি সাধনাকে শক্তিশালী ও ব্যাপক উজ্জ্বলতর করে তুলেছে।

৩য় পরিচ্ছেদ

উপমহাদেশে পারস্য সুফিবাদের প্রভাব

মরমিবাদ বা সুফিবাদের সূচনাকাল নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা বেশ কঠিন ব্যাপার। হিজরি ২য় শতাব্দীর আবু হাশেম সুফি (মৃত্যু: ১৬২হি.) কুফা নগরীতে বসবাস করতেন। ফিলিস্তিনের রামাল্লায় সর্বপ্রথম তিনিই সুফি দরবেশদের জন্য খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। খানকাহ হচ্ছে যিকির ও ধ্যানের উপযোগী বিশেষ আশ্রয়স্থল। ইসলামের উদ্ভব ঘটার মাত্র দেড়শ বছরের মধ্যে অত্যন্ত সন্তর্পণে সুফিমতের বীজ অংকুরিত হয়। আর হুজভিরি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *কাশফুল মাহজুব* এ ইসলামের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আর এই মতবাদকে ভিত্তি করে সুফি আবু হাশেম সুফি দর্শনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা করেন। (খানম, ২০০৩: ৩)

সুফিমতের প্রথম প্রবক্তা হলেন মিস্‌রিয় বা নুবিয় (Nubian) লেখক জুননুন মিসরি (মৃত্যু:২৪৫-২৪৬হি.) হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত দু-জন সুফি হলেন : হাসান বসরি (মৃত্যু: ১১০হি.) এবং ইবরাহিম আদহাম (মৃত্যু: ১৬২ হি.)। হিজরি ৩য় শতকে বায়েজিদ বোস্তামি (মৃত্যু: ২৩৪হি.) প্রকাশ্যে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় সুফিবাদের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাসাউফের ইতিহাসে হিজরি ৩য় শতক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই সময়ে বহু বুযুর্গ ও আরেফের আর্বিভাব ঘটেছিল। ইমাম গাযযালি ও আব্দুল কাদের জিলানি রহ. ইরফান ও তাসাউফের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। হিজরি ৬ষ্ঠ শতকে কবি সানায়ি গায্‌নাভির (মৃত্যু: ৫৪৫হি.) এরফানি কবিতা সুফি মতধারায় এক অন্যমাত্রা এনে দেয়। আর এ ধারা পরম্পরায় ফরিদুদ্দিন আত্তার সহ অন্যান্য সুফি কবিগণ নিজেদের স্বকীয়তার মাধ্যমে সুফিবাদের দর্শনকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। হিজরি ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে আর্বিভাব ঘটে মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি, মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির।

হিজরি ৭ম ও ৮ম শতক হচ্ছে ইরানের ইরফান ও তাসাউফ বিস্তারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কারণ, হিজরি ৭ম শতকের শুরুতে মোঘলরা ইরানে হামলা করে। ফলে ইরানে অস্থিতিশীল ও আতঙ্কজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ সময় ধর্মীয় বিশ্বাস ও নীতি নৈতিকতার ফলে সাধারণ জনগণ সুফি ও মাশায়েখদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। (তামিমদারি, ২০০৭ : ২০-৩১)

এলমে তাসাউফ চর্চা ও বিস্তারে হযরত জুন্‌নুন মিস্‌রি (রহ.) ও হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.) এর অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা তাঁরা তাসাউফের বিক্ষিপ্ত ক্ষেত্রগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে সুবিন্যস্ত করেন। (ভট্টাচার্য, ২০১৫: ৩৩)

মরমিবাদের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ ঘটেছে সুফিতত্ত্বের মাধ্যমেই। সুফিতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে মরুময় আরব দেশে। আর এখান থেকেই তা গোলাপকুঞ্জ পারস্যে গিয়ে পৌছে। পারস্যের ধর্মীয় চিন্তায় মরমি ভাবধারা অনুপ্রবেশের পাশাপাশি সেখানকার সুফি সাধকেরাও সুফিতত্ত্বকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন । আর ধীরে ধীরে সিরিয়া, মিশর, তুরস্ক, ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল এবং উপমহাদেশে সুফিমতের আগমন ঘটে আর কালক্রমে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে সুফিতত্ত্ব প্রবেশ করে। (হক, ১৯৩৫: ১৮)

আরবজাতি অতি প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবসা বাণিজ্য এবং বিদেশ ভ্রমণে অভ্যস্থ ছিল। হিজরি অষ্টম শতাব্দীতে আরব্য বনিকগণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করতে শুরু করে। আর এই ধারাবাহিকতায় ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গেও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ডক্টর কে.এম. মুন্সি সম্পাদিত *The History and culture of the Indian People* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরবদের সঙ্গে বঙ্গ অঞ্চলের যোগাযোগ অনেক আগেই শুরু হয়েছিল; অর্থাৎ আরব দেশে ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বেই আরব ব্যবসায়ীরা বঙ্গদেশে এসেছিল। আর এভাবেই সুফিমত ভারতে আসার আগেই ভারতীয় চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। (সাকলায়েন, ১৩৬৮: ৩,৭)

খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩১ অব্দে আলেক জান্ডার আরবেলার যুদ্ধে ইরানিদের পরাজিত করে পারস্যে গ্রীক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে আর্য ইরানিদের একটি বড় অংশ ভারতবর্ষে আগমন করে। তাদের আগমনের ফলে পারস্যের মাতৃভাষা এদেশের জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক পরিচিত হয়ে উঠে। আর তখন থেকেই এই উপমহাদেশের সাথে পারস্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ট হতে থাকে। আর ধীরে ধীরে এ ভাষা ও সংস্কৃতি বাংলার রাজদরবার ও সমাজে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করে । (খান, ২০১৭: ২৬)

বঙ্গদেশে সুফিদের প্রভাব ব্যাপক। বঙ্গের পশ্চিম থেকে পূর্ব প্রান্ত এবং উত্তর থেকে দক্ষিণভাগ পর্যন্ত প্রায় দুইশত বছরের মধ্যে দরবেশগণ এই পূণ্যভূমিতে আগমন করেন। সুদূর আরব ও পারস্য ভূমি থেকে তাঁরা এ অঞ্চলে আসেন। এ সমস্ত দরবেশগণ ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের এদেশীয় শাসকদের উপর ব্যাপক প্রভাব ছিল। এ কারনেই রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থায় তাঁরা মূখ্য ভূমিকা পালন করতেন। ধর্মীয় কট্টরপন্থি রীতি-নীতিতে এ সুফি দরবেশগণ মোটেও বিশ্বাসী ছিলেন না। সেজন্যই এতদঞ্চলের সাধারণ মানুষের মনে তাঁরা অতি সহজেই স্থান করে নিয়েছিলেন। (হক, ২০০৬: ১০৮-১০৯)

ভারতীয় উপমহাদেশ ও বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম এসেছিল মূলত সুফি দরবেশগণের হাত ধরে। তাঁরা জনসাধারণের মাঝে শান্তি-সাম্য-সম্প্রীতির বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ওলী ও দরবেশগণ এদেশের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতিতে কোনরূপ আঘাত না করে; প্রচলিত ভাষা ও ঐতিহ্যের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে সমন্বয় এবং সহমর্মিতার মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন শান্তির ধর্ম ইসলামের বাণী। এভাবেই সুফিবাদের অমোঘ মন্ত্র মানুষের মর্মে গ্রথিত হয়ে যায়। সুফিবাদের দর্শন কেবলমাত্র মানুষকে চিন্তাগতভাবে মর্মমূখী করে তোলেনি বরং জাগতিক ও মানবিকতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞানার্জনে মানব সমাজকে করে তোলে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত। (খালেক, ২০২০: ২০৪)

বাংলাদেশে আগত খ্যাতিমান বেশ কয়েকজন সুফি সাধকের নাম উল্লেখ করা হলো:

শাহ সুলতান রুমি (আগমন ১০৫৩); তিনি বাংলাদেশে সুফিতত্ত্ব নিয়ে আসেন। সৈয়দ বাশার শাহ (মৃত্যু:১০৩৯), দাতা গঞ্জ বক্শ (মৃত্যু: ১০৭২); তাঁকে সুফি তত্ত্বের প্রথম প্রচারক বলা হয়ে থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ের সুফিমতবাদের প্রবক্তা তাঁরাই।(হক, ১৯৩৫: ১৮)

এছাড়াও রয়েছেন - বাবা আদম শহিদ, শাহ সুলতান মাহি সওয়ার, মাহমুদ শাহ দৌলা শহীদ, মখদুম শাহ মাহমুদ গজনবি, শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজি, শাহজালাল (রহ.), শেখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা প্রমুখ। (রহিম, ১৯৮২: ৮৮-১১৫)

পারস্য সুফিবাদের প্রভাবে উপমহাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতিতে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। বাংলার কবি সাহিত্যিকেরা প্রাচীনকাল থেকেই পারস্য সুফিসাহিত্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে আসছেন। তারই ফলশ্রুতিতে এদেশে পারস্য অধ্যাত্ম সাহিত্য অনূদিত হয়েছে বারংবার। রবীন্দ্র- নজরুল- ফররুখ-লালন- হাসন রাজা তাঁদের সাহিত্যে পারস্যের ছোঁয়া রেখেছেন।

তথ্যসূত্র

১. আল-কুরআন, সুরা বাক্বারা (২), আয়াত ১৫১;

২. হালিম, আবদুল (১৯৯৮)। *মুসলিম দর্শন চেতনা ও প্রবাহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা;

৩. ইসমাঈল, মুহাম্মদ বিন (তা.বি.)। *সহীহুল বুখারী*, *১ম খণ্ড*, দেওবন্দ, আশরাফিয়া বুক ডিপো;

৪. তামিমদারি, আহ্মাদ (২০০৭)। তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনুবাদক), *ফার্সি সাহিত্যের ইতিহাস মতবাদ, যুগ, সাহিত্যশৈলী ও সাহিত্য প্রকরণসমূহ*, আল হুদা আন্তজার্তিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা;

৫. হক, খোন্দকার রিয়াজুল (২০০১)। *মরমি কবি সাবির আহমেদ চৌধুরী চৈতন্য- লালন রবীন্দ্র মরমি ঐতিহ্য সংক্রমণ*, যমুনা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং কোং, ঢাকা;

৬. রহমান, সাইদুর (১৯৮৪)। *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, আমিনুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা;

৭. শরীফ, আহমদ (২০১০)। *বাউল ও সুফি সাহিত্য*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা;

৮. ঝা, শক্তিনাথ (২০১৯)। *সুফি : মদিনা থেকে মহাস্থান গড়*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা;

৯. রহিম, মুহাম্মদ আবদুর (১৯৮২)। *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (অনূদিত), ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা;

১০. চৌধুরী, আবুল আহসান (২০১৩)। *রবীন্দ্রনাথের লালন*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা;

১১. প্রাগুক্ত, *বাউল ও সুফি সাহিত্য;*

১২. প্রাগুক্ত, *মরমি কবি সাবির আহমেদ চৌধুরী চৈতন্য -লালন- রবীন্দ্র মরমি ঐতিহ্য সংক্রমণ*,

১৩. খানম, মাহমুদা (২০০৩)। *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা;

১৪. প্রাগুক্ত, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস মতবাদ, যুগ সাহিত্যশৈলী ও সাহিত্য প্রকরণসমুহ;*

১৫. ভট্টাচার্য, প্রদ্যোৎ (২০১৫)। *বঙ্গে সুফি প্রভাব ও সুফিতত্বের ক্রমবিকাশ*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা;

১৬. হক, মুহাম্মদ এনামুল (১৯৩৫)। *বঙ্গে সুফি প্রভাব*, মহসীন এন্ড কোম্পানি, কলিকাতা;

১৭. সাকলায়েন, গোলাম (১৩৬৮)। *বাংলাদেশের সুফি সাধক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা;

১৮. খান, আবদুস সবুর (২০১৭)। *বাংলায় ফারসি ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাস*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা;

১৯. হক, মুহাম্মদ এনামুল (২০০৬)। *বঙ্গে সুফি প্রভাব*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা;

২০. খালেক, এস এম এ (২০২০)। *সুফি সংস্কৃতি ও সুফি চেতনা*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা;

২১. প্রাগুক্ত, *বঙ্গে সুফি প্রভাব;*

২২. প্রাগুক্ত, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস;*

২৩. মোস্তফা, কে. জি. (২০২০)। *তন্ময় পৃথিবী মন্ময় জীবন*, ৩১ জুলাই, www.dailynayadiganta.com;

২৪. সরকার, মো: সোলায়মান (১৯৮৪)। *ইবনুল আরাবী ও জালাল উদ্দীন রুমী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা;

২৫. http://hadith.net/post/1942/;

২৬. bn.banglapedia.org.

২য় অধ্যায়

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির পরিচিতি

১ম পরিচ্ছেদ - রুমির সংক্ষিপ্ত জীবনী

২য় পরিচ্ছেদ - রুমির সাহিত্যকর্ম

৩য় পরিচ্ছেদ - রুমির অধ্যাত্মচর্চা

১ম পরিচ্ছেদ

রুমির সংক্ষিপ্ত জীবনী

পৃথিবীর ইতিহাসে বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাঁরা ধ্রুবতারার মত সঠিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট মানবসমাজকে সত্যের পথে পরিচালনা করেন; মাওলানা জালালুদ্দিন মোহাম্মদ রুমি তাঁদেরই একজন। যিনি সকল জাতি-ধর্ম,বর্ণ ও শ্রেণি-পেশার মানুষদের সমমর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর অসাম্প্রদায়িক আধ্যাত্মিক বাণী গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে প্রেমের বার্তা।

রুমির আধ্যাত্মিক জীবনবোধ ও তার শাশ্বত সৌন্দর্য গোটা পৃথিবীতে আজও অনুকরণীয় হিসেবে প্রতিয়মান হচ্ছে। আল্লাহ প্রেমে মগ্ন হয়ে পরম সত্যের রহস্য উম্মোচনে তিনি ছিলেন এক নিবেদিত প্রাণ। গোটা পৃথিবীর পথপ্রদর্শক রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মত হতে পেরে রুমি নিজেকে সম্মানিত মনে করেছেন। মহানবি (সা.) তাঁর উম্মতগণের মাঝে আশা, ভালবাসা ও ধৈর্য্যের যে অমিয় বাণী প্রচার করেছেন, রুমি সেই পথের অনুসারী হয়ে প্রেম ও সত্যের বাণী গোটা মানব সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

মাওলানা জালালুদ্দিন মোহাম্মদ রুমি ৬০৪ হিজরির ৬ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১২০৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর খোরাসানের বালখ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ খোরাসানের অধিবাসি ছিলেন।

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির আসল নাম মোহাম্মদ। তাঁর উপাধি জালালুদ্দিন। তাঁকে কখনো কখনো মাওলানায়ে খোদাবান্দেগার নামেও ডাকা হয়। এছাড়াও তিনি মাওলানা, মাওলাভি, মাওলাভিয়ে বালখি প্রভৃতি উপনামে পরিচিত ছিলেন। (বালখি, ১৩৭৩: মোকাদ্দেমে: ১৩)

তবে তিনি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। (Brown, 1969: 515)

রুমির জন্ম খোরাসানের বালখ নগরীতে হলেও, জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি তুরস্কের কোনিয়ায় অতিবাহিত করেছেন এবং এই কোনিয়ার মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

তাঁর পিতার নাম সুলতানুল উলামা মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ। মাতা মোমেনা খাতুন। পিতামহের নাম হোসাইন ইবনে আহমাদ খাতিবি বালখি। মাতামহ ছিলেন মালেকা জাহান। রুমি ছিলেন বাদশাহ মোহাম্মদ শাহ খাওয়ারেযমি'র দৌহিত্র। (নদভি, ১৯৮৭: ৩৫৫)

পিতার দিক থেকে রুমি ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবং মাতার দিক থেকে ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.) এর বংশধর ছিলেন। (ইসলামি বিশ্বকোষ, ১৯৯৫:৩৯৫)

রুমির পিতা বাহাউদ্দিন ওয়ালাদের উপাধি ছিল সুলতানুল উলামা। তিনি বালখের একজন বিখ্যাত আধ্যাত্মিক আলেম ও মিষ্টভাষী বক্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় সমান পারদর্শিতা ছিল তাঁর। তিনি সৃষ্টি জগতের গূঢ় রহস্য তাঁর সহচরদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে তুলে ধরতেন। বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ শেখ নাজমুদ্দিন কুবরার অন্যতম খলিফা ছিলেন। (শাহেদী, ২০০৮ : ১৯)

রুমির বালখ নগরী ত্যাগ

হিজরি ৬১০ সাল মোতাবেক **১২১৩** খিস্টাব্দে রুমি পিতা সুলতান বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ ও তাঁর পরিবারের সাথে বালখ ত্যাগ করেন। তাদের বালখ ত্যাগের পেছনে দু'টি প্রধান কারণ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, খাওয়ারিযম প্রশাসনের সাথে অর্থ্যাৎ বাদশাহ আলাউদ্দিন খাওয়ারিযম শাহের সাথে সৃষ্ট মতবিরোধ, দ্বিতীয়ত ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হওয়া এবং ইরানে মোঙ্গলদের সম্ভাব্য আক্রমনের আভাস পাওয়ার পরেই তারা দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। (নদভি, ১৯৭৯: ৩৩৮)

জালালুদ্দিন রুমির জন্মের পর **১২১৩** খ্রিস্টাব্দ থেকে তৎকালিন ইরানে মোঙ্গলদের অত্যাচারে মুসলিমদের অবস্থা মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। তাদের ধ্বংসযজ্ঞ ক্রমশ বাড়তে থাকায় ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সূচনা হয় নতুন আরেক ধ্বংসযজ্ঞের। **১২১৯** খিস্টাব্দে চেঙ্গিস খান নামক কুখ্যাত শাসক বহু মুসলিম সাম্রাজ্যকে ব্যাপকভাবে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। এরপর **১২৫৬** খ্রিস্টাব্দে হালাকু খান পূর্ববর্তীদের ন্যায় পুনরায় এ ধ্বংসলীলা শুরু করে। একের পর এক বিভৎস তাণ্ডবে বাগদাদে ইসলামি খেলাফতের অবসান হয়। আর **১২৬৬** খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই বিশাল স্পেনিয় মুসলিম শাসনেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। (Awais, 2008: 12)

পিতা বাহাউদ্দিন ওয়ালাদের বিচক্ষণ ও দূরদর্শি সিদ্ধান্তের কারণেই রুমি ও তাঁর পরিবার এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পান। বালখ ত্যাগ করে বাগদাদ হয়ে পবিত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা নগরীতে যাওয়ার পথে তাঁরা বর্তমান ইরানের খোরাসান প্রদেশের নিশাপুরে প্রখ্যাত সুফি সাধক শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তার (রহ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। জ্ঞানতাপস আত্তার বালক রুমির সহাস্য মুখের দিকে তাকিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে বাহাউদ্দিনকে বলেন-

زود باشد که این پسر، آتش در سوختگان عالم زند

অর্থ: অচিরে তোমার এই সন্তান প্রেমের আগুনে এই ধরণির প্রেমিকদের পোড়াবে।

ফরিদুদ্দিন আত্তার রুমির পিতাকে ছেলের প্রতি সতর্ক ও যত্নশীল হওয়ার পরামর্শ দেন। সেই সাথে আত্তার তাঁর *আসরারনামা* কাব্যের একটি অনুলিপি বালক রুমিকে উপহার দেন। (তাদাইয়েন, ১৩৭৭ হি.শা: ২২০)

দেশ ভ্রমণ ও শিক্ষাজীবন

রুমি বাল্যকালে পিতার সাথে হজ্জ পালন করেন। হজ্জ পালনের পর দু'জন সিরিয়া গমন করেন। তারপর **১২১৭** খ্রিস্টাব্দে মালাতিয়া[১] পৌঁছেন। **১২১৯** খ্রিস্টাব্দে সিভাসে[২] আসেন এবং ইবযিন জান[৩] এর নিকটবর্তী আকশিহির[৪] নামক স্থানে চার বছর অবস্থান করেন। অত:পর **১২২২** খ্রিস্টাব্দে সালজুকি বাদশাহদের অন্যতম শাসনকেন্দ্র লারিন্দায় গমন করেন এবং সেখানে সাত বছর অতিবাহিত করেন। **১২২৮** খ্রিস্টাব্দে সালজুক সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদের আমন্ত্রণে সপরিবারে কোনিয়ায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। (আজিজুল হক, ১৯৬৯: ১৯)

---

১. **মালাতিয়া :** আর্মেনিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের একটি শহর।
২. **সিভাস :** মধ্য তুর্কির একটি প্রদেশ।
৩. **ইবযিন জান :** মধ্য এশিয়ার একটি প্রাচীন শহর।
৪. **আকশিহির :** মধ্য এশিয়ার ইবযিন জান শহরের নিকটবর্তী একটি শহর।

রুমির প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয় পিতা বাহাউদ্দিন ওয়ালাদের কাছেই। বাল্যকাল থেকেই তিনি আধ্যাত্মিক দুনিয়ার যাহেরি ও বাতেনি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে শুরু করেন। ১২৩১ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৬২৮ হিজরিতে রুমির পিতা ইন্তেকাল করেন। এসময় রুমির বয়স ছিল চব্বিশ বছর। (ইসহাক, ১৯৭৪: ৩)

বালখের অধিবাসি সাইয়্যেদ বুরহানুদ্দিন মুহাক্কেক ছিলেন তাঁর পিতার একজন ঘনিষ্ঠ শিষ্য। বাহাউদ্দিন ওয়ালাদের মৃত্যুর এক বছর পর তিনি কোনিয়ায় আসেন এবং রুমির পড়ালেখার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রুমি সাইয়্যেদ বুরহানুদ্দিনের সাহচর্য গ্রহণ এবং তাঁর পরামর্শক্রমে নানা দেশ সফর করেন। বুরহানুদ্দিন একাধারে নয় বছর রুমিকে নবি-রাসূলগণের জীবনাচরণ সর্ম্পকে জ্ঞান দান করেন। টানা চল্লিশ দিন কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে সিয়াম পালন ও যোগ সাধনার নানা পন্থা সর্ম্পকে তাকে অবহিত করেন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, উচ্চতর জ্ঞান আহরণ, তরিকতের বুজুর্গগণের সাহচর্য প্রাপ্তি এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় পূর্ণতা হাসিলের উদ্দেশ্যে রুমি নানা দেশ সফর করেছেন।

তিনি চার বছর আলেপ্পোর হালাবিয়া এবং সিরিয়ার দামেস্ক নগরীর খ্যাতনামা ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সাহচর্যে জ্ঞান সাধনার প্রয়াস পান এবং তাফসির, হাদিস, ফিকহ, কালাম শাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। (হামিদ, ২০০১: ১৬৪)

নানা দেশ সফরের মাধ্যমে রুমির জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনে পূর্ণতা আসে। বুরহানুদ্দিন তাঁকে জ্ঞানের সকল শাখায় সমানভাবে পারদর্শী করে তুলে ভবিষ্যৎবাণীতে বলেন, তোমার জীবনে এমন এক মহৎ বন্ধুর আগমন ঘটবে, যিনি হবেন তোমার হৃদয়ের আয়নাস্বরূপ। তিনি আধ্যাত্মিক জগতের রহস্য উন্মোচনে সহায়তা করে পথপ্রদর্শক হিসেবে তোমাকে পথ দেখাবেন। তোমরা দু'জন দু'জনের পরিপূরক হবে। গোটা বিশ্বে তোমাদের বন্ধুত্বের জয়ধ্বনি হবে। (Helminski , 2000: 10)

১২৩১-১২৩২ খ্রিস্টাব্দে রুমি আলেপ্পোর মাদ্রাসা-ই হালাবিয়ার বিশিষ্ট ওস্তাদ আল্লামা কামালউদ্দিন ইবনে আদিমের সান্নিধ্যে হানাফি ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বাহাউদ্দিন ইবনুল আরাবির সাহচর্যে এসে আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন।

দামেস্কের মাদরাসা-ই মুকাদ্দাসিয়ায় অবস্থান করে শেখ মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি, সা'দ উদ্দিন হামাবি, শেখ উসমান রুমি, ফাখরুদ্দিন এরাকি, শেখ আওহাদুদ্দিন কেরমানি, শেখ সদরুদ্দিন কাউনাভি (রহ.) এর সাহচর্যে এলমে হাক্বিকাত ও মারেফাতের জ্ঞান অর্জন করেন। (শাফাক, ১৩৬৯হি.শা: ২৬৯)

অত:পর ১২৩৬- ১২৩৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে রুমি কোনিয়ায় ফিরে আসেন। সেখানে এসে পিতার অন্তিম উপদেশ মোতাবেক শিক্ষা-দীক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে তাঁর ভক্ত ও অনুসারিগণের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে থাকেন। দীর্ঘকাল কোনিয়ায় অবস্থান করার কারণেই তিনি মাওলানা রুমি নামে অধিক পরিচিতি পেয়েছেন। কেননা পূর্ব রোমের অন্যতম নগরী ছিল কোনিয়া এবং তা রোমিয়াতুস্ সোগ্‌রা অর্থ্যাৎ ছোট রোম নামে প্রসিদ্ধ ছিল। (শাহিদী, ২০০৮: ২০) কোনিয়ায় যখন রুমি অধ্যাপনা করতেন, তখন তাঁর শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত চারশ'র অধিক শিষ্য ও আলেম উলামা উপস্থিত হতেন।

রুমির পারিবারিক জীবন

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি লারান্দায় অবস্থানকালে পিতা বাহাউদ্দিন ওয়ালাদের আদেশে ৬২৩ হিজরি মোতাবেক ১২২৬ খ্রিস্টাব্দে উনিশ বছর বয়সে মাওলানা শরফুদ্দিন লালার কন্যা গওহর খাতুনকে বিবাহ করেন। গওহর খাতুন ও রুমি দম্পতির দু'জন পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। একজন সুলতান মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ (পিতামহের নামে তাঁর নামকরণ করা হয়) এবং দ্বিতীয়জন আলাউদ্দিন মোহাম্মদ নামে পরিচিত।

রুমির প্রথম স্ত্রী মৃত্যুবরণ করায় তিনি কোনিয়ার অধিবাসি গেরা খাতুনের সাথে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আর এ দম্পতির দু'জন সন্তান জন্ম নেয়। একজন পুত্র মুযাফ্ফরউদ্দিন আর একজন কন্যা মালেকা খাতুন। মুযাফ্ফরউদ্দিন 'আমিরে আলম' নামে খ্যাত ছিলেন। রুমির মৃত্যুর মাত্র চার বছর পরেই এ পুত্রের মৃত্যু হয়।

রুমির প্রথম পুত্র বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ পিতামহের ন্যায় সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র আলাউদ্দিন মুহাম্মদ রুমির মুর্শিদ শামস তাবরিযির প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। আলাউদ্দিন যুবক বয়সেই মৃত্যুবরণ করেন। (বালখি, ১৩৭৩ হি.শা: মোকাদ্দেমে ৫১)

রুমির জীবনে জ্ঞানতাপস শামসের আগমন

রুমি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ শেষে কোনিয়াতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। সেখানে ওয়াজ-নসিহত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয় সর্ম্পকে পাঠদান করতেন। তিনি তাঁর জীবনে বৈষয়িক সুনাম ও খ্যাতি অর্জনের প্রতি নির্মোহ ছিলেন। তিনি নিজের মধ্যে এক মহাপরিবর্তনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিলেন। একদিন রুমি তাঁর শিষ্য ও আলেমদের পাঠদান করছিলেন। তখন তাঁর সামনে শামস তাবরিযি এসে উপস্থিত হন। উল্লেখ্য যে, তিনি ৬৪২ হিজরির জমাদিউল আখের মাসের ২৭ তারিখ মোতাবেক ১২৪৫ খ্রিস্টাব্দে কোনিয়ায় আসেন। শামস ও রুমির প্রথম সাক্ষাতের একটি রোমাঞ্চকর ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। ঘটনাটি এরূপ:

روزی شمس به مجلس مولانا که در آن مولانا در حال سخنرانی بود، وارد شد. او از مولانا که در کنارش چند کتاب وجود داشت، پرسید، این ها چیست؟

مولانا جواب داد : قیل و قال است.

شمس می گوید : تو را با این ها چه کار است؟ و کتاب ها را داخل حوضی که در آن نزدیک می اندارد.

مولانا می گوید : ای درویش برخی از این کتاب ها یادگار پدرم و نسخه منحصر به فرد و نایاب است.

شمس تبریزی دست در آب فرو کرده و کتاب ها ذره ای خیس نشده باشند.

مولانا با تعجب می پرسد، این چه سری است؟

شمس جواب می دهد : این ذوق و حال است که تو را از آن خبری نیست. (namnak.com)

অনুবাদঃ

একদিন রুমির শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হয়ে শামস জালালুদ্দিনকে কয়েকটি বই দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- এগুলো কি?

রুমি উত্তরে বললেন- এগুলো জ্ঞান ও গবেষণার বিষয়।

শামস বললেন : এগুলো দিয়ে তোমার কাজ কি? এবং বইগুলো নিকটস্থ একটি চৌবাচ্চায় ফেলে দিলেন।

মাওলানা বললেন : এই দরবেশ, এই বইগুলো অত্যন্ত দুর্লভ ও গুরুত্বপূর্ণ আর এগুলো আমার পিতার স্মৃতিচিহ্ন।

শামস তাবরিযি পানিতে হাত দিয়ে বইগুলোকে অক্ষত অবস্থায় তুলে আনলেন এবং সেগুলো এতটুকুও সিক্ত ছিলনা। রুমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এর রহস্য কি?

শামস জবাব দিলেন : এটা অধ্যাত্মবাদের এমন রহস্য, যা থেকে তুমি বেখবর।

এখানে তিনি মূলত অধ্যাত্মবাদের রসাস্বাদন করার যে ক্ষমতা ও মানবাত্মার মাঝে এর প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা এই স্তরে পৌছাতে হলে পার্থিব ও পুঁথিগত জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি অপার্থিব- স্রষ্টা সম্বন্ধীয় জ্ঞানার্জনও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শামসের সাথে মোলাকাতের পূর্বে রুমির মাঝে এই অনুভূতির অনুপস্থিতি ছিল। এই ঘটনার পর থেকেই রুমির চিন্তা জগতে আমূল পরিবর্তন চলে আসে। রুমির চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞান-গরিমা একেবারেই পাল্টে যায়। তিনি

শামসের সাথে আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। আর এভাবেই রুমি এক নবজীবন লাভ করেন। তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্ম যেমন: মসজিদের ইমামতি, মাদ্রাসায় পাঠ দান, ওয়াজ-নসিহত প্রদান ত্যাগ করে দিনমান শুধু শামসের সান্নিধ্যেই কাটাতে লাগলেন। শামসের প্রতি মাওলানার আসক্তি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

ফলশ্রুতিতে রুমির অনুসারিগণ শামসের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে থাকেন। রুমি মাদরাসায় পাঠদান বন্ধ করে দেওয়ায় ভক্ত-অনুসারিগণ শামসের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করেন। প্রচণ্ড সমালোচনা ও শত্রুতার সম্মুখীন হয়ে শামস তাবরিয ৬৪৩ হিজরি মোতাবেক ১২৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ শাওয়াল কোনিয়া ত্যাগ করে সিরিয়ার দামেস্কে চলে যান। (শাহেদ, ১৩৯২ হি.শা: ১১)

শামসের আগমন রুমির জীবনে হঠাৎই এক চমক এনে দেয়। রুমি শামসের এমন আকস্মিক আগমনকে স্বাগত জানিয়ে গেয়ে ওঠেন –

ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی منتها
ای آتش افروخته درویشهٔ اندیشه ها
امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی
بر مستمندان آمدی چون بخش و فضل خدا

(ফোরুযানফার, ১৩৭৫ হি.শা: ৪৯)

বঙ্গায়ন:

হে সহসা আগমনকারী, তোমার দয়া অসীম
আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনার জগতে আলোক বিচ্ছুরণকারী
আজ এলে হাসাতে, বন্দি জীবনে মুক্তির দিশা নিয়ে
এসেছ নিঃস্ব হয়ে, তবে খোদার ফজিলত ও অনুগ্রহ আছে তাতে।

শামসের কোনিয়া ত্যাগ করে দামেস্কে চলে যাওয়ার ঘটনাটি রুমি কোনভাবেই মেনে নিতে পারেননি। তিনি পুত্র বাহাউদ্দিন ওয়ালাদকে একাধিক বার অনুরোধ করে শামসকে ফিরিয়ে আনতে বলেন। পিতার মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা দেখে পুত্র বাহাউদ্দিন শামসকে পুনরায় কোনিয়ায় ফিরিয়ে আনেন। রুমি শামসের আগমনের খুশিতে কাব্যছন্দে গেয়ে ওঠেন –

مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

(বাকায়ি নায়িনি, ১৩৯৩হি.শা: ১৬৯)

অনুবাদঃ

মৃত ছিলাম, জীবিত হলাম ক্রন্দনরত ছিলাম, হেসে উঠলাম

প্রেমের মহাসম্পদ এলো, তাইতো চিররত্ন হলাম।

(দিওয়ানে শামস তাবরিয, গযল নং-১৩৯৩)

শামস তাবরিযি কোনিয়ায় ফিরে আসার কিছুদিন পর থেকেই কোনিয়াবাসি পুনরায় তাঁর প্রতি বিরূপ আচরণ করতে শুরু করে। রুমির একদল অনুসারি যারা শামসের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন; শামসের নিখোঁজ হওয়ার জন্য তাদেরকেই দায়ী বলে ধরে নেওয়া হয়। আর এ বিষয়টি লোকসমাজে বহুল প্রচলিত। কেননা, শামসের সান্নিধ্য লাভের পর রুমি তাঁর দৈনন্দিন কার্যাবলি থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, রুমির ভক্ত-অনুসারিগণেরাই ষড়যন্ত্র করে শামসকে হত্যা করেছিল। তবে এ ব্যাপারে ভিন্নমতও প্রচলিত রয়েছে যে, শামস স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করেছেন। কারণ, দ্বিতীয়বার নিরুদ্দেশ হওয়ার পর শামসের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ফ্রাঙ্কলিন ডি. লুইস বেশ জোর দিয়েই বলেছেন যে, রুমির অনুসারিগণের শামস্ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি অনেকটাই ভিত্তিহীন। এটি কেবল এক প্রকার গুজবের রূপ ধারণ করে যুগ যুগ ধরে লোকমুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। (Franklin, 2000:193)

তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, রুমির ভক্তগণের শামসের প্রতি অসন্তোষ সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক ছিলনা। এর পেছনে বেশকিছু কারণ বিদ্যমান ছিল। প্রথমত, মাওলানা রুমি তাঁর পেশাগত পোশাক ছেড়ে অদ্ভুত রকমের দরবেশি পরিচ্ছদ পরিধান করতে শুরু করেন। আর এতে শামসের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়ত, শামস ইসলামি রীতি-নীতি পালনে যথেষ্ঠ উদাসীন ছিলেন। অনেকে এ ধরনের জীবন যাপনকে ইসলাম পরিপন্থি বলে মনে করতেন। এমন একজন ব্যক্তির প্রতি মাওলানার আকর্ষণ ও উম্মাদনার কারণে সাধারণ মানুষ তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। (ইসহাক, ১৯৭৪: ১৭-১৮)

হিজরি ৬৪৫ মোতাবেক ১২৪৭ খিস্টাব্দের দিকে শামস আবার নিখোঁজ হন। মাওলানা অস্থির ও বেহাল অবস্থায় তাঁর মুর্শিদকে খুঁজতে এশিয়া মাইনর, সিরিয়ায় ভ্রমণ করেন। কিন্তু শামসকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে একথা সত্য যে, রুমির কবিতায় শামস চির অমর হয়ে রয়েছেন। রুমির ভাষায় –

چو جمال او بتابد چه بود جمال خوبان

که رخ چو آفتابش بکشد چراغ ها را

(গযল, দিওয়ানে শামস)

When his glory shines, like the glory of beauty

His sun like face blows out the lamps.

তাবরিযের কি গৌরব শামসের দীপ্ত মুখচ্ছবি

আলোক বিকীর্ণ করা কি উজ্জ্বল তেজোদীপ্ত রবি।

(সাত্তার, ১৯৮৭: ৪২)

রুমি তাঁর জীবনে জ্ঞানতাপস শামস তাবরিযের সাহচর্যে পেয়েছিলেন ১৮ মাস। (শাহিদী, ২০০৮: ২১) তবে অন্য একটি মতানুসারে, রুমি এই রহস্যময় পুরুষের সাহচর্য পেয়েছিলেন মাত্র ৩ বছর। আর এ স্বল্প সময়েই রুমি এক নতুন মানুষে পরিণত হন। (Haque, 2007: 42)

এ মতামত দু'টো ভিন্ন হওয়ার কারণ হচ্ছে, শামস যখন কোনিয়ায় রুমির জীবনে প্রথমবারের মত আসেন, তখন ছিল ১২৪৫ খ্রিস্টাব্দ। এরপর ২ বার নিখোঁজ হয়েছেন তিনি। প্রথমবার নিখোঁজ হওয়ার পর তিনি পুনরায় ফিরে আসেন। আর দ্বিতীয়বার নিখোঁজ হয়েছেন ১২৪৭ খ্রিস্টাব্দে। এ হিসেব মোতাবেক ৬৪২হি. - ৬৪৫ হি.পর্যন্ত শামস রুমির জীবনে ছিলেন। তবে যদি অনুপস্থিত থাকা দিনগুলো বাদ দিয়ে বিবেচনা করা হয়, তবে ১৮ মাসের হিসেবটা গ্রহণযোগ্যতা পায়। কেননা ৩ বছরের মধ্যে বেশ কিছুটা সময় শামস নিখোঁজ ছিলেন।

শামসের বিচ্ছেদ যাতনায় রুমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি দামেস্ক সফর থেকে ফিরে আসার পর সালাহউদ্দিন ফরিদুন যারকুব নামক এক ব্যক্তিকে সহচর হিসেবে গ্রহণ করে তাঁকে খলিফা নিযুক্ত করেন। এরপর রুমি আরেক ব্যক্তিকে নিজের খলিফা নিযুক্ত করেন যিনি হুসসাম উদ্দিন হাসান ইবনে মুহাম্মদ নামে পরিচিত

ছিলেন। পরবর্তীতে হুসসামউদ্দিন চালাবি মাওলানার জীবদ্দশায় দশ বছর এবং মৃত্যুর পরে দশ বছর তাঁর খলিফা ও স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। (শাহিদী, ২০০৮: ২২)

শামসের আধ্যাত্মিক প্রভাব রুমিকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, বাহ্যিকভাবে রুমি শামসকে হারালেও তাঁর অন্তর থেকে কখনোই সেই নামটি মুছে যায়নি। বরং তাঁর অনুপস্থিতি আরো বেশি করে তাঁর উপস্থিতির জানান দিয়েছে রুমির হৃদয়ে।

Rumi was a prominent teacher of Islamic law but it all changed when a wandering dervis, Shamsuddin of Tabriz introduced him to the Sufi path. He followed Shams as a devoted disciple until Shams died. His love and his bereavement for the death of Shams found their expression in a surge of music, dance and lyric poems. (Alam, 2008:7)

রুমি তাঁর জীবনে মহাপুরুষ শামস তাবরিযির গুরুত্ব কতটা, তা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন

এভাবে –

مولوی هرگز نشد مولای روم

تا غلام شمس تبریز نشد

অর্থ:

মৌলভি (রুমি) শামস তাবরিযির অধীনস্ত না হলে,

কখনও রোমের অভিভাবক হতে পারতেন না।

(নদভি, ১৯৭৯: ৩৪৩)

শামসের প্রতি রুমির আকর্ষণ এবং তাঁর সাথে বিচ্ছেদ হওয়ার যে বেদনা, তা রুমিকে একজন নতুন মানুষে রুপান্তর করেছে। তাঁকে গতানুগতিক জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে জানতে সহায়তা করেছে। স্রষ্টার সাথে একাত্ন হওয়ার পথ বাতলে দিয়েছে।

রুমির মৃত্যু

মাওলানা জালালুদ্দিন মুহাম্মদ রুমি ৬৭২ হিজরির ৫ জমাদিউল আখের মোতাবেক ১৭ ডিসেম্বর ১২৭৩ খ্রিস্টাব্দে কোনিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর ৩ মাস। (Browne ,1969 :518)

রুমির মৃত্যুর পূর্বে কোনিয়ায় চার দিন ধরে ভীষণ ভূমিকম্প হতে থাকে। এলাকার লোকজন মাওলানার কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, পৃথিবীর ক্ষুধা লেগেছে। সে ভাল খাবার চায়, খুব শীঘ্রই তার ইচ্ছা পূরণ হবে। এর কিছুদিন পর থেকেই রুমির শরীর ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক কামালউদ্দিন ও গঞ্জাফর তাঁর চিকিৎসায় নিয়োজিত ছিলেন। অনেক ওষুধ সেবনের পরেও রুমির অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল না। রুমির শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করেন –

چه دانی تو که در باطن چه شاهی همنشین دارم

دخ زرین من منگر که پای آهنین دارم

বঙ্গায়নঃ

কোন্ মহারাজ আমার আনন্দের সঙ্গী, তা তুমি জান না।

আমার পদযুগল লৌহের ন্যায় সবল, আমার পাণ্ডুবর্ণ (বিবর্ণ) মুখপানে দৃষ্টি দিওনা।

(দিওয়ানে শামস, গযল নং– ১৪২৬)

রুমি মৃত্যুর সময় আরো বলেন যে, প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদের মাঝে যে পর্দার আড়াল থাকে, মৃত্যুর মাধ্যমে সে আড়ালটুকুও দূরীভূত হয়। তাঁর মৃত্যুতে সব শ্রেণি ও ধর্মের মানুষ সমবেত হয়ে শোক পালন করেছিল। মাওলানাকে তুরস্কের কোনিয়ায় পিতা বাহাউদ্দিন ওয়ালাদের মাযার বাগে সুলতান এর পাশে সমাহিত করা হয়। (উদ্দিন, ১৯৭৮: ১৪৮-১৪৯) বর্তমানে মাওলানা রুমির মাযার কুব্বে খুযারা নামে পরিচিত। (সাফা, ১৩৩২হি.শা: ১৬০)

মাওলানার পুত্র বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ পিতার মৃত্যুতে তাঁর রচিত মাসনাভি গ্রন্থে লেখেন –

بعد از آن نقل کرد مولانا، زین جهان کثیف پر از عنا

پنجم ماه در جماد آخر، بود نقلان آن شاه فاخر

سال و هفتاد و دو بده بعد، ششصد از عهد هجرت احمد

چشم زخمی چنین رسید بخلق، سوخت جانها ز صدمت آن برق

کرزه افتاد در زمین آن دم، گشت نالان فلک در آن ماتم

(ওয়ালাদ, ১২৯১ হি.শা: ২১১)

কাব্যানুবাদঃ

অতঃপর স্থানান্তর হলেন মাওলানা, ছেড়ে হিংসা-বিদ্বেষের দুনিয়া

জমাদিউল আখের মাসের পঞ্চম তারিখে, ফিরে গেলেন স্রষ্টার সান্নিধ্যে।

সালটি ছিল ছয়শ' বাহাত্তর(৬৭২), মহানবির (সা.) হিজরতের পর

হৃদয় সমূহ ব্যথিত হল বজ্রনাদে, ঊর্দ্ধাকাশে আহাজারির সুর উঠল বেজে।

২য় পরিচ্ছেদ

রুমির সাহিত্যকর্ম

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি অধ্যাত্মবাদের ধারক ও বাহক। আধ্যাত্মিকতা প্রভাব ফেলেছে তাঁর চিন্তা-চেতনায়। কাব্য রচনায় তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। কুরআন-হাদিসের নির্যাস নিয়ে রচনা করেছেন পাহলভি ভাষার কুরআন; অধ্যাত্মবাদের মহাসমুদ্র দ্বিপদী কাব্য মাসনাভি। রুমি শৈশবকাল থেকেই পারিবারিক আবহের আর্শিবাদে ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের সাথে পরিচিত ছিলেন। উচ্চশিক্ষা অর্জন করে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত থাকার পরেও তিনি কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেননি। দরবেশ শামস তাবরিযির প্রভাবে রুমির মাঝে অভাবনীয় পরিবর্তন আসে। আর তার রেশ থেকে যায় মাওলানার জীবনাবসান পর্যন্ত। রুমি জাতীয় বা বিশ্বকবির খেতাব অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁর দিওয়ানে শামস বা মাসনাভি শরিফ রচনা করেননি। বাল্যকাল থেকে ১২৪৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর মাঝে কাব্য রচনার কোনরূপ প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়নি। শামসের আগমন এবং বিচ্ছেদ যাতনা ব্যক্তি রুমিকে কবি রুমিতে পরিণত করে। রুমির সাহিত্যকর্মগুলোর মধ্যে রয়েছে –

মাসনাভিয়ে মানাভি

দ্বিপদী কাব্য মাসনাভি। যার লিপিকার ছিলেন রুমির ঘনিষ্ট সহচর হুসসামউদ্দিন চালাবি। কুরআন ও হাদিসের নির্যাস এবং রুমির সজ্ঞায় রচিত এই অনবদ্য কাব্যসম্ভার। হিজরি সপ্তম শতক এবং তার পরবর্তী সময়ে রচিত হয়েছে মাসনাভি। তাঁর দার্শনিক বক্তব্য অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এ কাব্যে। রুমি এই কাব্যের মাধ্যমে সারাবিশ্বে প্রেমময় বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন। মাসনাভিয়ে মানাভি এক অনবদ্য সাহিত্য যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মাসনাভির ভূমিকায় রয়েছে স্রষ্টার স্তুতি বর্ণনা। এ কাব্যগ্রন্থ হলো তাওহিদেরই ধারাভাষ্য এবং আত্মা পরিশোধনের মন্ত্রণা। মাসনাভি বাহরে রামাল ছন্দ রীতিতে ছয় খণ্ডে ২৬,০০০ বেইতে রচিত অমর আধ্যাত্মিক এক কাব্যগ্রন্থ। প্রখ্যাত রুমি গবেষক আর. এ নিকলসনের মতে এর বেইত সংখ্যা ২৫৬৩৩ টি। ছয় খণ্ডের বেইত সংখ্যার হিসাব প্রদান করেছেন এভাবে -

১ম খণ্ডে ৪০০৩ টি, ২য় খণ্ডে ৩৮১০ টি, ৩য় খণ্ডে ৪৮১০ টি, ৪র্থ খণ্ডে ৩৮৫৫ টি, ৫ম খণ্ডে ৪২৩৮ টি এবং ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৪৯১৬ টি। (fa.m.wikipedia.org)

মাসনাভি কাব্যের সূচনাংশ থেকে কয়েকটি বেইত তুলে ধরা হলো:

بشنو از نی چون حکایت می کند

از جدایی ها شکایت می کند

کزنیستان تا مرا ببریده اند

از نفیرم مرد و زن نالیده اند

(যামানি, ১৩৮১ : ১৫)

ইংরেজি অনুবাদঃ

Listen to the story told by the reed of being separated

Since I was cut from the reed bed,

I have made this crying sound…

(Barks, 1995:17)

বঙ্গানুবাদ :

বাঁশির কাছে শোন সে কোন্ কাহিনী বর্ণনা করছে

বিচ্ছেদের বিরহ গাঁথার বয়ান দিচ্ছে।

যখন আমায় বাঁশ বাগান থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো

সেই বিচ্ছেদ যাতনায় নারী-পুরুষ অশ্রুসিক্ত হলো।

মাসনাভির প্রথম খণ্ডে নেই নামায় বাঁশির করুণ আত্মকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বাঁশির যে মোহনীয় সুর মানব মনকে পুলকিত করে তোলে তা মূলত বাঁশির করুণ কান্নার আওয়াজ। যে আওয়াজ মানুষের মর্ম স্পর্শ করে। উৎপত্তিস্থল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার যে বেদনা, তা বাঁশির সুরের মাধ্যমে শ্রোতার কাছে পৌছায়। রুমির মাসনাভি কাব্য যেন অন্তরের আওয়াজ। এ কাব্যে রয়েছে হৃদয়ের আকুল আকুতি; যে হৃদয় স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভে সদা তৎপর।

দিওয়ানে শামস তাবরিযি

রুমির সাথে শামসের বিচ্ছেদ এবং এর যাতনায় দগ্ধীভূত হয়ে তিনি এক বিশালায়তন অমর কাব্য দিওয়ানে শামস তাবরিযি বা দিওয়ানে কাবির রচনা করেন। রুমির অবিস্মরণীয় প্রথম কাব্য এটিই। গ্রন্থটি মূলত রুমির গযল সংকলন। এতে গযল, রুবাই ও তারজিবান্দের পঙক্তি সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। (www.iranmirrorbd.com)

এই কাব্য রচনার সময়কালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ও প্রধান ভাগটির রচনাকাল (৬৪২-৬৫২) হিজরি। অর্থ্যাৎ শামসের সাথে রুমির সাহচর্য ও বিচ্ছেদের সময়কাল। দ্বিতীয় অংশটি প্রথমটির তুলনায় ছোট। এই অংশটি (৬৫২-৬৬২) হিজরিতে রচিত। এ অংশটি শেখ সালাহউদ্দিন যারকুবের সাথে ১০ বছর অতিবাহিত করা কালীন রচিত হয়। তৃতীয় অংশটি আকারে দ্বিতীয় অংশের চেয়েও ছোট; যা হুসসামউদ্দিন চালাবির সাহচর্যে (৬৬২-৬৭২) হিজরিতে লেখা।(শাহেদী, ২০০৮: ২২)

১৩০২ হি.শা তে পঞ্চাশ হাজার বেইত নিয়ে দু'টি অধ্যায়ে দিওয়ানে শামস তাবরিযি হিন্দুস্তানের লক্ষ্ণৌ থেকে প্রথমবারের মত প্রকাশিত হয়। বদিউজ্জামান ফোরুযানফারের দিওয়ানে শামস তাবরিযি গ্রন্থটি বর্তমানে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য, যা (১৩৩৬- ১৩৪৪ হি.শা) মধ্যবর্তী সময়ে সম্পাদিত ও ১৩৭৫ হি.শা তে কুল্লিয়াতে শামসে তাবরিযি শিরোনামে তেহরান থেকে প্রকাশিত হয়। (rch.ac.ir)

দিওয়ানে কাবিরের কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো:

عید آمد و عید آمد، وان بخت سعید آمد

برگیر و دهل می زن، کآن ماه پدید آمد

برخیز به میدان رو، در حلقه رندان رو

رو جانب مهمان رو، کز راه بعید آمد

(দিওয়ানে শামস, গযল : ৬৩২)

কাব্যানুবাদ

ইদ এলোরে ইদ এলো, যেন সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে গেলো,

জেগে ওঠ, বাজাও ঢোল; কেননা সেই কাঙ্খিত মাস যে চলে এলো।

ওঠ, শামিল হও রেন্দনদের (জ্ঞানী, আশেক, তরিকতের পথপ্রদর্শক) দলে;

যাও আগত অতিথিদের কাছে,

যাঁরা বহু পথ অতিক্রম করে এসেছে।

আরেকটি গযলের নমুনা:

بمیرید، بمیرید، درین عشق بمیرید

درین عسق چو مردید، همه روح پذیرید

یکی تیشه بگیرید، پر حفره زندان

چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید

(দিওয়ানে শামস, গযল : ৬৩৬)

বঙ্গায়নঃ

মরে যাও, মরে যাও, এই প্রেমে তুমি বিলীন হও।

এই প্রেমে আত্মবিলীনের মাধ্যমে স্বীয় অস্তিত্বে জয়লাভ কর।

কুঠারাঘাতে বিদীর্ণ কর কয়েদখানার সেই তমসাচ্ছন্ন কুটির,

তখন সবাই তোমার চোখে হয়ে উঠবে বাদশাহ ও আমির।

ফিহে মা ফিহঃ

আরবি প্রবচনে গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে। খাস মজলিসে প্রদত্ত এবং পুত্র বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ ও অপর এক মুরিদ দ্বারা সংকলিত মাওলানার প্রায় ৩০ বছরের ভাষণসমূহের সারসংক্ষেপ এটি। এই গ্রন্থের অর্থ: তাতে আছে, যা কিছু আছে। এতে আধ্যাত্মিক বিষয়াবলির বিশ্লেষণ রয়েছে। গ্রন্থটি রুমির গদ্য সাহিত্যের অর্ন্তভূক্ত, যা অত্যন্ত সরল ও সাবলীল ভাষায় রচিত। রুমির মৃত্যুর পর গ্রন্থটি সংগ্রহের কাজ পূর্ণাঙ্গরুপে সম্পাদিত হয়। মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি এই গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর ফুতুহাতুল মাক্কিয়াহ্ গ্রন্থে বলেছেন –

كتاب فيه ما فيه بديع فی معانيه

اذا عايفت ما فيه رايت الدرّيحويه

অর্থাৎ, ফিহে মা ফিহে এমন একটি গ্রন্থ যার অর্থগত তাৎপর্য খুবই চমৎকার। তুমি যদি এর অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু অবহিত হও তবে এক আলোকোজ্জ্বল জীবনদর্শন দেখতে পাবে। (বাকায়ি নায়িনি, ১৩৯৩হি.শাঃ ২২৩)

১৪০১ হিজরি শামসিতে বদিউজ্জামান ফোরুযানফার গ্রন্থটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। (negahpub.com)

ফিহে মা ফিহ থেকে একটি রুবাই নমুনা হিসেবে দেওয়া হলো:

این من نه منم آنکه منم گویی کیست

گویا نه منم در دهنم گویی کیست

من پیرهنی بیش نیم سر تا پای

آن کس که منش پیرهنم گویی کیست

(বাকায়ি নায়িনি, ১৩৯৩হি.শা: ২৩২)

বঙ্গায়নঃ

এই আমি সেই আমি নই, আমি যে সেই আমি একথা বলল কে!

একথা আমি বলছিনা, যেন আমার মুখ থেকে বলছে অন্য কেউ।

এক টুকরো কাপড়ে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করেছি,

কিন্তু কোন্ সে অস্তিত্ব, যে আমার পুরো শরীরাবৃত করে রেখেছে!

রুবাইয়াতে রুমিঃ এটি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির রুবাই এর সংকলন। এখানে ১৬০০ এর কিছু অধিক রুবাই স্থান পেয়েছে। এতে রয়েছে ৩৬৭৬ টি পংক্তি।

মাকাতিব বা মাকতুবাতে মাওলানাঃ এটি মাওলানার পত্রাবলির সংকলন।

গাযালিয়াতে মাওলানাঃ এতে স্থান পেয়েছে ২৫০০ গযল।

মাজালিসে সাবআ'ঃ এটি ৭টি পৃথক মজলিসে দেওয়া মাওলানা রুমির আধ্যাত্মিক ভাষণ সংকলন।

এছাড়াও স্রষ্টা, হযরত মুহাম্মদ (সা.), শামস তাবরিযি কে নিয়ে লিখেছেন প্রায় ৩০০০ প্রেমসংগীত।

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির কাব্যপ্রতিভার বিকাশ ঘটেছে শামসের আধ্যাত্মিক পরশে। যে সাহিত্য গোটা বিশ্বে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছে।

৩য় পরিচ্ছেদ

রুমির অধ্যাত্মচর্চা

ইংরেজি Spiritualism শব্দটির অর্থ হলো অধ্যাত্মবাদ। এর কিছু সমার্থক শব্দ রয়েছে। যেমন: আধ্যাত্মিকতা, পারলৌকিকতা, অপার্থিব ভাব ইত্যাদি।

অধ্যাত্মবাদ এমন এক খোদায়ি অনুভূতি ও মানসিক অনুসন্ধান, যার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টি জগতের রহস্য উন্মোচনের সঠিক পথের দিশা পাওয়া যায়। এই বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যমে আত্মার অলৌকিক ক্ষমতার উপলব্ধি ঘটে। (আফশার, ১৩৭৩হি.শা: ৭৮৮)

বস্তুগত বা শারীরিক জিনিসের বিপরীতে মানবাত্মা স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রচেষ্টাকে অধ্যাত্মবাদ বলে। সহজ কথায়, আত্মা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বিশেষ আলোচনাকে অধ্যাত্মবাদ বলে।

যে আলোচনায় অপার্থিব, পারলৌকিক বিষয়ের রহস্য উদঘাটনের প্রয়াস করা হয়, তাই আধ্যাত্মিকতা। (meaningguru.com)

মানব হৃদয় যখন আত্মার একাকিত্বের নিঃশব্দ শূন্যতা অনুভব করে, তখন সে হৃদয় পরমাত্মার সান্নিধ্যে যেতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

According to Dr. Maya Spencer-

Spirituality involves the recognition of a feeling or sense or belief that, there is something greater than myself, something more to being human than sensory experience and that the greater whole of which we are part is cosmic or divine in nature. Opening of the heart is an essential aspect of true spirituality. (rcpsych.ac.uk)

আধ্যাত্মিক সাধকেরা এরফানি অভিজ্ঞতা ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সাহায্যে স্রষ্টার সাথে নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এ সকল সুফি সাধকগণ অন্তরে স্রষ্টার উপস্থিতি অনুভব করতেন। সুফিবাদ এমন এক ভাবাবেগ, যা প্রকৃতরূপে ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়। একে কেবল অনুভব করা যায়।

ইসলামের কয়েকজন সুফি সাধকের মধ্যে ইবনুল আরাবি (১১৬৫-১২৪০খ্রি), ফরিদ উদ্দিন আত্তার (১২২১ খ্রি. মৃত্যু), ইমাম গাজ্জালি (১০৫৮-১১১১খ্রি), সানায়ি গাযনাভি (১১৩০ খ্রি.মৃত্যু) এবং জালালুদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩খ্রি.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (সরকার, ১৯৮৪: ২২০)

রুমিকে বলা হয় প্রেমের দূত। স্রষ্টার সাথে মানুষের বিচ্ছিন্নতা, আর এই কণ্টকময় পথ পাড়ি দিয়ে তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়ার তীব্র আকুতি, মানবতা থেকে ঐশ্বরিক গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্যে প্রয়োজন এক গভীর অনুভূতি, যাকে বলা হয় প্রেম। পাশ্চাত্যে Philosophical ও Theological Anthropology নামে জ্ঞানের যে শাখা গড়ে উঠেছে, রুমিকে তার অন্যতম জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। (Arasteh, 1972: ix)

মাওলানা রুমির অধ্যাত্নচর্চায় ইসলামি জীবনদর্শনের প্রায় সবদিক যথার্থভাবে আলোচিত হয়েছে। দ্বিপদী কাব্য মাসনাভি হচ্ছে অধ্যাত্নবাদের বিশ্বকোষ বা Bible of Sufism and Theosophy.

রুমির অধ্যাত্ন দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে প্রেমতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, আত্নাতত্ত্ব, ইনসানে কামেল হওয়ার প্রয়াস, ওয়াহদাতুল ওজুদের বিভিন্ন স্তর ইত্যাদি।

আমেরিকা প্রবাসী বিখ্যাত ইরানি মনোবিজ্ঞানী আরাস্তে মন্তব্য করেছেন –

Rumi discovered that man's central existential problem arose from his separation from nature and from his contradictory character. (Arasteh, 1974: vii)

রুমির জ্ঞানতত্ত্ব

মাওলানা রুমি জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসেবে পবিত্র কুরআন ও মহানবির (সা:) মুখনিঃসৃত বাণীকেই গ্রহণ করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে মহানবি (সা.) এর বাণী ও কুরআনের ওহি একই। কেননা রাসূল (সা.) যা বলেন; তা আল্লাহ পাকের নির্দেশেই বলেন। নিজস্ব প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে তিনি কোন কিছুই বলতেন না। রাসূল (সা.) আল্লাহ পাকের নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন করার পাশাপাশি নিষিদ্ধ বিষয়গুলো পরিহার করেছেন। ইসলামি রীতি-পদ্ধতিতে আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত ঐশী বাণীর পরে রাসূল (সা.) এর হাদিস প্রাধান্য পায়।

রুমি জ্ঞানের সংজ্ঞায় নতুন এক পরিভাষার সংযোগ ঘটিয়েছেন। জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছেন সজ্ঞা কে। রুমি দৈনন্দিন জীবন-যাপনের আলোকে অর্জিত সাধারণ অভিজ্ঞতা এবং উপস্থিত বুদ্ধির উপর সজ্ঞাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সজ্ঞা শব্দটি ইংরেজিতে Intuition হিসেবে পরিচিত। সজ্ঞা শব্দটি দ্বারা প্রমাণ, সাক্ষ্য, সচেতন যুক্তি বা কিভাবে জ্ঞান আহরিত হল তা জানা ছাড়াই জ্ঞানার্জনের ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিভিন্ন লেখক সজ্ঞার নানাবিধ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন একে অচেতন জ্ঞানে প্রত্যক্ষ প্রবেশ, অচেতন চেতনা, অন্তঃস্থিত অনুভূতি (inner sensing),অর্ন্তদৃষ্টি (inner insight), অচেতন প্যাটার্ন পরিচিতি, সচেতন যুক্তি ছাড়া প্রবৃত্তিগতভাবেই কিছু বোঝার ক্ষমতাকে বোঝায়। দার্শনিকগণ বলেন– সজ্ঞাকে প্রায়ই সহজাত প্রবৃত্তি, সত্য, বিশ্বাস, অর্থ ও অন্যান্য বিষয়ের সাথে মিলিয়ে ফেলা হয়। সহজাত প্রবৃত্তি, বিশ্বাস ও সজ্ঞা অনেকাংশে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। (www.bissoy.com)

Intuition is the ability to acquire knowledge without recourse to conscious resoning. The word intuition comes from the Latin verb intueri.

In the East, Intuition is mostly interwined with religion and spirituality and various meanings exist from different religious texts. (en.m.wikipedia.org)

রুমি তাঁর রচনায় কুরআন-হাদিসের অসংখ্য আয়াত, বাণীর উদ্ধৃতি ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে এই সজ্ঞাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কখনো রূপক-উপমার ব্যবহার করে বিভিন্ন ঘটনাকে তথ্যবহুল ও আকর্ষনীয়রূপে পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। কঠিন ও গম্ভীর বিষয়গুলো তাঁর সরল প্রকাশভঙ্গিতে হয়ে উঠেছে অর্থবহ ও মোহনীয়। এ কারণেই তাঁর মাসনাভির প্রসিদ্ধি এতটাই যে, একে ফারসি ভাষার কুরআন বলা হয়। রুমির সজ্ঞা ও বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রচনাকে করে তুলেছে আরও সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য। (আনিসুজ্জামান, ২০০৮: ১৬)

রুমির আধ্যাত্মিক দর্শনে আত্মাতত্ত্বের বিশ্লেষণ

আত্মজ্ঞানার্জনই তত্ত্বজ্ঞানের মূলকথা। নিজের আত্মাকে যে পরিপূর্ণ রূপে চিনতে পেরেছে, সেই ব্যক্তি অবশ্যই তার স্রষ্টার অস্তিত্বও অনুভব করেছে। আত্মজ্ঞান লাভ করে যে, তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী হয় সে। রুমি মাসনাভির সূচনা করেছেন আত্মার করুণ আহাজারি দিয়ে। আত্মার স্থলে রূপকার্থে ফুটে উঠেছে বাঁশের বাঁশরির বিরহ সুর।

بشنو از نی چون حکایت می کند

از جدایی ها شکایت می کند

অর্থ:

শোন, বাঁশরি কোন্ কাহিনী বর্ণনা করছে,

অভিযোগের সুরে বিচ্ছেদের গাঁথা যেন গেয়ে চলেছে।

মানবাত্মা আলমে আরওয়াহ বা আত্মিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই আর্তনাদ করতে শুরু করে। পরমাত্মার সান্নিধ্য পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এখানে আলমে আরওয়াহ হচ্ছে পরমাত্মার সান্নিধ্য, যা বাঁশবনের রূপকাশ্রয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

মহান আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টির মালিক এবং আদেশকর্তা। রুমি মাসনাভির ষষ্ঠ খণ্ডে বলেছেন–

پس له الخلق و له الامرش بدان

خلق صورت، امر جان، راکب بر آن

(আশরাফযাদে, ১৩৯৩হি.শা: ৯২৬)

অনুবাদঃ

অতঃপর আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর আদেশ সম্পর্কে জানো।

তিনি আকৃতি সৃষ্টি করেন, আর তাঁর আদেশেই আত্মা প্রতিস্থাপিত হয়।

নবি মোহাম্মদ (সা.) এর কাছে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে জানতে চাওয়ায় কোরআনিক ভাষায় নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে এর জবাব দেওয়া হয়েছে –

يسءلونک عَنِ الرُّوح قل الرُّوحُ مِن امرِ ربّی وما اوتیتم مِن العلمِ الاَّ قلیلا .

(সূরা : বনী-ইসরাইল, আয়াত: ৮৫)

অর্থঃ মানুষ আপনাকে (মহানবি সাঃ কে) আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন, আত্মা আমার পালনকর্তার এক বিশেষ নির্দেশ। এ বিষয়ে সামান্য জ্ঞানই তোমাদের দান করা হয়েছে।

আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আত্মার উৎপত্তি এবং আলমে আরওয়াহ হচ্ছে আত্মার উৎপত্তিস্থল। রুমি পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার ঐক্যকে অসাধারণ উপমার সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন–

گر تو صد سیب و صد آبی شمری،

صد نماند، یک شود چون بفشری

(বালখি, ১৩৭৩ হি.শা: ৩৯)

বঙ্গায়নঃ

যদি একশটি আপেল ও নাশপাতি পাশাপাশি রেখে গণনা কর; তবে তার সংখ্যা নির্ধারণ করে বলতে পারবে। আর যদি এগুলোর রস একপাত্রে রাখা হয়, তখন এগুলোর নিজস্ব অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে। অর্থ্যাৎ তাদের অস্তিত্ব একে অপরের মাঝে বিলীন হয়ে যাবে।

রুমির চিন্তাজগতে এ ধারণাটি ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে যে, আল্লাহ পাক আদম(আ.) কে সৃষ্টি করার পর তাঁর শরীরে আত্মা প্রতিস্থাপন করে তাঁকে এক চেতনাসম্পন্ন মানবে পরিণত করলেন। আদমকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। সেই সাথে ফেরেশতাদের আদমকে সেজদাহ করতে আদেশ করলেন। কিন্তু কেন? কেননা আদমের মাঝে অর্থ্যাৎ পুরো জগতের সমস্ত আশরাফুল মাখলুকাতের শরীরে যে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়েছে, তা পবিত্র পরমাত্মারই সত্ত্বা। আর সেজন্যেই ফেরেশতাকুল মানবরূপী আদমের সম্মানে সেজদাহ করেছেন। (সরকার, ১৯৮৪: ২২৪)

আল্লাহ এবং মানবজাতি সমজাতীয় অথবা মানবাত্মাও পরমাত্মার ন্যায় অবিনশ্বর; এমন কোনকিছু প্রমাণ করা মোটেই মাওলানার উদ্দেশ্য নয়। তিনি শুধু বোঝাতে চেয়েছেন যে, দেহাবয়ব ও সংখ্যার বিচারে মানুষ অসংখ্য। তবে আত্মার দিক থেকে বিবেচনা করলে সেই আত্মা একক ও অভিন্ন।

এই একই ধরনের ভাবনা শেখ সাদি (রহ.) এর গুলেস্তান নামক কালজয়ী গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ের ১০ম গল্প বনী আদম এ ফুটে উঠেছে এভাবে-

بنی آدم

بنی آدم اعضای یک دیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

(fa.m.wikipedia.org)

অসাধারণ এ কবিতাটির বঙ্গানুবাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস করলাম:

আদম সন্তান

দুনিয়ায় আদম সন্তান আছে যারা;

অভিন্ন আত্মা ও নির্যাসে সৃষ্ট তারা

একজন যবে ব্যথায় ব্যথিত হয়,

অন্যজনেরও সে ব্যথা অনুভূত হয়

অপরের ব্যথায় যদি ব্যথিত না হও

মানুষ হওয়ার যোগ্য তুমি নও।

যার ইংরেজি অনুবাদ এরূপ:

Human Beings

Human beings are members of a whole

In creation of one essence and soul

If one member is afflicted with pain

Other members uneasy will remain

If you have no sympathy for human pain

The name of human you can't retain.

(the conversation.com)

২০০৯ সালের ২০ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ইরানি নববর্ষ 'নওরোয' উপলক্ষ্যে পারস্যবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর শুভেচ্ছা বাণী হিসেবে একটি ভিডিও বার্তা প্রেরণ করেন, এতে তিনি শেখ সাদি'র 'বনী আদম' কবিতাটির প্রথম লাইনের অনূদিত অংশটিকে উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। (Wikipedia)

আমির খসরু দেহলাভি রচিত নিম্নোক্ত চরণ দু'টোর ভাবার্থও মাওলানা রুমি ও শেখ সাদির কবিতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:

من تو شدم، تو من شدی من تن شدم، تو جان شدی

تا کس که نگوید بعد از این، من دیگرم تو دیگری

(paymanpsychology.com)

বঙ্গায়ন:

আমি হলাম তুমি আর তুমি হলে আমি, আমি যদি দেহ হই প্রাণ তার তুমি

এরপর যেন কেউ না বলে, আলাদা তুমি আর আমি।

মানবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যকার অবিচ্ছেদ্য ও গভীর সম্পর্ককে মাওলানা রুমি অসাধারণ ভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, যখন কোনো মৌমাছি মধুর মধ্যে পড়ে যায়, তখন তার পুরো অঙ্গ মধুতে নিমজ্জিত হয়। সে তার ডানা বা অন্যান্য প্রত্যঙ্গ নাড়াতে পারেনা। ঠিক একইভাবে সাধক যখন মহান আল্লাহর স্মরণে মগ্ন হয়ে গভীর সাধনায় মনোনিবেশ করেন, তখন নিজের অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়ে ফানাফিল্লাহ'র পর্যায়ে উপনীত হন, অর্থ্যাৎ খোদায়ি অনুভূতিতে নিজেকে বিলীন করে দেন।

সুফি সাধক মনসুর হাল্লাজের আনাল হক (আমিই সত্য) বাণীর সাথে রুমির এই উপমাশ্রিত উদাহরণটি অত্যন্ত সাজুয্যপূর্ণ। (পাল, ১৩৬০,বাং : ১০৪)

রুমির প্রেমতত্ত্ব

রুমির মনোজগতে অধ্যাত্মবাদের যে চিরন্তন সৌন্দর্যের ফল্গুধারা সৃষ্টি হয়েছিল, তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁর মাসনাভি অধ্যাত্মবাদ ও প্রেমের জয়গানে ভরপুর। প্রেম বা এশ্ক হচ্ছে কারো প্রতি হৃদয়

নিংড়ানো মধুর ভালবাসা মিশ্রিত প্রচণ্ড আকর্ষণের নাম। কোনকিছু পাওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রেমেরই প্রতিফলন। ইবনুল আরাবির মতে প্রেম তিন প্রকার। মানবীয় প্রেম, আধ্যাত্মিক প্রেম, ঐশী প্রেম।

মানবীয় প্রেম বলতে পার্থিব জগতের মানুষের অন্তরে একে অপরের প্রতি যে ভালবাসা বা আকর্ষণ থাকে, সেই প্রেমকে বোঝায়। যার গন্ডি পৃথিবীর মানুষগুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। পারস্পারিক, শারীরিক ও মানসিক আকর্ষণের দ্বারাই তার প্রকাশ ঘটে থাকে। এ ধরনের প্রেমে বান্দা কখনোই স্রষ্টামুখী হতে পারেনা।

আধ্যাত্মিক প্রেম হলো মরমি বা অতীন্দ্রিয় প্রেম। এই প্রেম নিবেদিত হয় কেবল স্রষ্টার উদ্দেশ্যেই। সাধারণ ও সংকীর্ণ প্রেমাকর্ষণের বাইরেও রয়েছে উচ্চমার্গীয়- গভীরতর প্রেমের আদর্শ, যেখানে মানবাত্মা পরমাত্মার সাথে প্রণয়ে ব্যাকুল। এই প্রণয়কেই বলা হয় আধ্যাত্মিক প্রেম।

আর ঐশী প্রেম হলো পরম সত্তা মহান আল্লাহর প্রতি অন্তরের গভীর হতে উৎসারিত প্রগাঢ় অনুরাগ। ক্ষণস্থায়ী জীবনকে তুচ্ছ ভেবে চিরস্থায়ী জীবনের জন্য স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করাই ঐশী প্রেমের মূলমন্ত্র। যে প্রেম পার্থিব কোনো বিনিময়ের মুখাপেক্ষী নয়, যা শুধু স্রষ্টাকেই নিবেদন করা হয়। এই দু'ধরনের প্রেমই কেবল মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন ঘটাতে সক্ষম। (সরকার, ১৯৮৪: ২১১)

রুমি ইবনুল আরাবির এই মতকে পুরোপুরি সমর্থন করেছেন। রুমির ভাষ্যমতে, প্রেমের ক্ষেত্রে যাবতীয় যুক্তি ও বিশ্লেষণ একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। এগুলোর দ্বারা প্রেমকে সঙ্গায়ন বা বর্ণনা সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন –

هرچه گویم عشق را شرح و بیان

چو به عشق آیم خجل گردم از آن

گرچه تفسیر زبان روشنگر است

لیک عشق بی زبان، روشنتر است

(বালখি, ১৩৭৩ হি.শা: ১৪)

অনুবাদঃ

প্রেমের বর্ণনা করি যতই, প্রেমে পতিত হয়ে সে বর্ণনাতেই লজ্জিত হই

মুখের ভাষায় প্রেম সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়;

তবে তা বর্ণনায় নয়, বরং অনুভবেই স্পষ্টতর হয়।

রুমি সর্বদা আধ্যাত্মিক ও ঐশী প্রেমের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তি হিসেবে তিনি একজন সংসারী মানুষ ছিলেন। তবে জ্ঞানতাপস শামস তাবরিযির সংস্পর্শে তিনি অনেকটাই বদলে যান। পার্থিব প্রেম-ভালবাসায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। জাগতিক প্রেমের অসারতা নিয়ে তিনি বলেছেন-

عشق های کز پی رنگی بود

عشق نبود؛ عاقبت ننگی بود

(বালখি, ১৩৭৩ হি.শা: ১৮)

অনুবাদঃ

রঙ-রুপের ভিত্তিতে যে প্রেম হয়, মোটেই তা প্রকৃত প্রেম নয়;

লজ্জা ও অনুতাপ তার পরিণতি হয়।

মাওলানা সর্বদাই খোদাপ্রেমে মগ্ন থাকতেন। এই প্রেমে আসক্ত হয়েই তিনি বিখ্যাত সব কাব্যের জন্ম দিয়েছেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি একজন প্রখ্যাত আলেম ছিলেন। তবে শামসের আগমন ও বিচ্ছেদ যেন রুমির জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তাঁর অন্তরের খোদাভক্তি তাঁকে সুফি রুমিতে পরিণত করেছে। তাঁর চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণায় রয়েছে শুধু সেই অদৃশ্য সত্তার প্রতিচ্ছবি। যার প্রতিফলন ঘটেছে রুমির কালজয়ী মাসনাভি ও দিওয়ানে কাবিরে।

The Muslim Encyclopedia of Islam এ বলা হয়েছে,

Rumi is one of the few intellectuals and mystics whose views have so profoundly affected the world views in its higher perspective in large parts of the Islamic world. (Kapur, 2004: 2812)

রুমির ব্যক্তিগত জীবনাচরণ ও তাঁর রচনার মূল বক্তব্য সমগ্র সৃষ্টি জগতের সাথে ঐশী প্রেমের মাধ্যমে এক মানবীয় সম্পর্ক স্থাপনের শিক্ষা দেয়। শুধু তাই নয়, মানব মনের দোটানা ও অস্থিরতা প্রশমনের দাওয়া জানতেন রুমি। রুমির প্রেমময় অমিয় সুধা পান করে পৃথিবীর প্রেমহীন তৃষ্ণার্ত মানুষেরা জীবনের নতুন মোড় খুঁজে পায়। জঞ্জাল ও কণ্টকাকীর্ণ পৃথিবীকে প্রেমের ছোঁয়ায় সুশোভিত করে তোলে।

তথ্যসূত্র

ফারসি গ্রন্থসমূহঃ

১. বালখি, মাওলানা জালালুদ্দিন মোহাম্মদ (১৩৭৩হি.শা)। *মাসনাভিয়ে মাওলানা জালালুদ্দিন মোহাম্মদ বালখি*, ১ম খণ্ড, তেহরান;

২. যামানি, কারিম (১৩৮১হি.শা)। *মাসনাভিয়ে মানাভি*, দাফতারে আভভাল, তেহরান;

৩. নদভি, আবুল হাসান আলি (১৯৭৯)। *তারিখে দাওয়াত ওয়া আযিমাত, মাজালেসে তাহক্বিকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম*, লক্ষ্ণৌ;

৪. তাদাইয়েন, আতাউল্লাহ (১৩৭৭হি.শা)। *বে দুম্বা'লে আফতাব আয কোনিয়া তা' দামেস্ক*, তেহরান;

৫. শাহেদ,জাফর ইব্রাহিমি (১৩৯২হি.শা)। *কেসসে হা'য়ে শিরিনে মাসনাভিয়ে মাওলাভি*, ১ম খণ্ড, তেহরান;

৬. ফোরুযানফার, বদিউজ্জামান (সম্পাদিত)(১৩৭৫হি.শা)। *কুল্লিয়াতে দিওয়ানে শামস*, ১ম খণ্ড, গযল নং: ১, তেহরান;

৭. বাকায়ি নায়িনি, আসাদুল্লাহ (১৩৯৩হি.শা)। *গোযিদেয়ে অসা'রে মাওলানা*, দিওয়ানে শামস, তেহরান;

৮. সাফা, যাবিউল্লাহ (১৩৩২হি.শা)। *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, ১ম খণ্ড, তেহরান;

৯. ওয়ালাদ, বাহাউদ্দিন (১২৯১হি.শা)। *ওয়ালাদ ন'মেহ*, তেহরান;

১০. আফশার, গোলাম হোসেইন ছদরি (১৩৭৩হি.শা)। *ফারহাঙ্গে ফারসিয়ে এমরুয*, তেহরান;

১১. আশরাফযাদে, রেজা (১৩৯৩হি.শা)। *মাসনাভিয়ে মানাভি*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বেইত: ৭৮, তেহরান;

১২. বালখি, মাওলানা জালালুদ্দিন মোহাম্মদ (১৩৭৩হি.শা)। *মাসনাভিয়ে মাওলানা জালালুদ্দিন মোহাম্মদ বালখি*, ১ম খণ্ড, বেইত: ৬৮৪, তেহরান;

১৩. প্রাগুক্ত, বেইত: ১১২-১১৩;

১৪. প্রাগুক্ত, বেইত: ২০৬;

ইংরেজি গ্রন্থসমূহঃ

1. Browne, E.G (1969). *A Literary History of Persia*, vol- 2, The University Press, Cambridge;
2. Awais, Hasan Bin (2008). *Understanding Rumi through learning his Influence on Iqbal*, Journal of three day International History Conference for celebrating the 800th Anniversary of Rumi, University of Sargodha, Sargodha;
3. Helminski, Camille and Kabir (2000). *Rumi Daylight A Daybook of spiritual Guidance*, Shambhala South Asia Editions, Boston;
4. Franklin, D. Lewis (2000). *Rumi: Past and Present, East and West*, One World Publishers, Oxford, England;
5. Haque, Sirajul (edited)(2007). *News letter, special issue on the year of Rumi, 800th Birth Anniversary*, Iranian Cultural Center, Dhaka;
6. Alam, Irshad (2008). *Rumi and Muin:Burning in the love of God*, Sufi peace mission, Dhaka;
7. Arasteh, A. Reza (1972). *Rumi, the Persian ,the Sufi*,Routledge and kegan paul, London;

8. Arasteh, A.Reza (1974). *Rumi,the Persian,the sufi,*Routledge and kegan paul, London;
9. Kapur, Subodh (2004). *Encyclopedia of Islam,*Cosmo publication, New Delhi;
10. Barks, Coleman (1995). *The Essential Rumi,* Harper Collins Publishers, Newyork;

বাংলা গ্রন্থসমূহঃ

১. *সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ*, (১৯৯৫)। ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ;
২. নদভি, সায়্যিদ আবুল হাসান (১৯৮৭)। *ইসলামি রেনেসাঁর অগ্রপথিক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা;
৩. শাহেদী, মুহাম্মদ ঈসা (২০০৮)। *মসনবী শরীফ*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা;
৪. ইসহাক, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ (১৯৭৪)। *বিশ্ব প্রেমিক রুমি*, ১ম খণ্ড, সিফাত প্রকাশনী, ঢাকা;
৫. হামিদ, মো. আব্দুল ও ঢালী, মুহাম্মদ আবদুল হাই (২০০১)। *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা;
৬. আজিজুল হক, শায়খুল হাদিস আল্লামা (১৯৬৯)। *মছনবী শরীফ*, ১ম খণ্ড, বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ঢাকা;
৭. সাত্তার, আবদুস (১৯৮৭)। *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ;
৮. সরকার, মো: সোলায়মান আলী (১৯৮৪)। *ইবনুল আরাবি ও জালাল উদ্দিন রুমি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা;
৯. আনিসুজ্জামান, ড. (২০০৮)। *মৌলানা জালালুদ্দীন রুমীর ৮শ' তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক রুমী সম্মেলন' ০৭*, স্মারকগ্রন্থ, আল্লামা রুমি সোসাইটি বাংলাদেশ, ঢাকা;
১০. পাল, হরেন্দ্র চন্দ্র (১৩৬০বাং)। *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস*, কলকাতা;

Web Address:

১. www.meaningguru.com;
২. https://www.rcpsych.ac.uk;
৩. https://theconversation.com;
৪. https://en.m.wikipedia.org;
৫. www.bissoy.com;
৬. https://namnak.com;
৭. https://fa.m.wikipedia.org *মাসনাভিয়ে মানাভি বার আসাসে নুসখেয়ে কৌনিয়ে ওয়া মাকা'বেলে বা' তাসহিয়ে ওয়া তাবে নিকলসন*। তাসহিয়ে, মোকাদ্দেমে ওয়া কাশফুল বায়ান আয কাওয়ামুদ্দিন খোর্‌রামশাহি;
৮. www.iranmirrorbd.com খান, ড. আবদুস সবুর (১২ জুলাই,২০১৬)। *মওলানা জালালুদ্দিন রুমি: আত্মার বাঁশিবাদক;*
৯. https://negahpub.com;
১০. https://fa.m.wikipedia.org;
১১. https://paymanpsychology.com *রাওয়ান শেনাসিয়ে পেইমান;*

৩য় অধ্যায়

স্রষ্টা ও সৃষ্টির পারস্পরিক প্রেমাকর্ষণ ও রুমির প্রেমতত্ত্ব

১ম পরিচ্ছেদঃ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যবর্তী প্রেমাকর্ষণ ও তার স্বরূপ বিশ্লেষণ

২য় পরিচ্ছেদঃ রুমির প্রেমতত্ত্ব

১ম পরিচ্ছেদ

স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যবর্তী প্রেমাকর্ষণ ও তার স্বরূপ বিশ্লেষণ

সৃষ্টিকর্তার প্রবল প্রেমাকর্ষণের বলে সৃষ্ট হয়েছে গোটা সৃষ্টিজগত। স্রষ্টা তাঁর প্রেমের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এই পুরো জগত সৃষ্টির মাধ্যমে। স্রষ্টা যদি এই প্রেমের প্রতিফলন ঘটানোর প্রত্যয় ব্যক্ত না করতেন; তাহলে হয়ত এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিই হত না। আর আজকের এই পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি অন্যকিছুই হত। মহান সৃষ্টিকর্তার গভীর প্রেম ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে গোটা পৃথিবী ও বিশ্ব-জগতের যা কিছু আছে; সবকিছুই একটা নিয়মতান্ত্রিক গতিতে চলমান রয়েছে। তাঁর আদেশবলেই একদিন এই সমস্ত কিছু ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে। এই গোটা জগতে কোন প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে না। মহান আল্লাহ তায়ালা মাটি ও রূহের সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন এই জীবজগত। অ'লামে আরওয়াহ্ অর্থ্যাৎ রূহের জগত থেকে বহু পথ অতিক্রম করে একটি রূহ তার নির্দিষ্ট দেহে প্রতিস্থাপিত হয় সেই পরম স্রষ্টার নির্দেশেই। সৃষ্টিকর্তা মাতৃগর্ভে এই রূহ প্রবিষ্ট দেহটির রক্ষণাবেক্ষণ করেন পরম যত্নে। সৃষ্টির প্রতি যদি স্রষ্টার দয়া ও ভালোবাসা না থাকত, তবে সেই সৃষ্টি কখনোই অস্তিত্ব লাভ করত না। রূহের জগত থেকে রূহেরা নানারূপে পৃথিবীতে আগমন করে ঠিকই, তবে তাদের মাঝে সেই জগতে পুনরায় ফিরে যাবার ব্যাকুলতাও থাকে প্রবল। কেননা এই পার্থিব জীবনের অবসান ঘটার মাধ্যমেই তারা আবারো ফিরে যেতে পারবে তাদের পরম স্রষ্টার সান্নিধ্যে।

পরম স্রষ্টা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার সাথে সাথে গোটা সৃষ্ট জগতকে উপহার দিয়েছেন প্রেম-ভালবাসা-মায়া-মমতা। স্বীয় প্রেমভাণ্ডার থেকে মমতা ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বজগতে। আর অবশিষ্ট সবটুকুই রয়েছে স্রষ্টার নিকটে। পার্থিব জগতে মানব ও জ্বীন জাতি যতই সীমা লঙ্ঘনকারি হয়ে উঠুক না কেন; স্রষ্টা তাঁর প্রেমের গুণে সব অপরাধ ক্ষমা করে দেন। স্রষ্টা যদি পরম প্রেমের আধার না হতেন তাহলে সীমালঙ্ঘনকারিরা তাৎক্ষণিক সাজাপ্রাপ্ত হত। অন্যায়ের পর অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে মহান রাব্বুল আলামীন কখনোই বান্দাকে নিরাশ করেন না। বান্দাকে কৃত পাপের জন্য ক্ষমা করে দেন। শুধু জীবজগত নয়, জড়পদার্থেরাও একে অপরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। আনবিক আকর্ষণের ফলে কোন পদার্থের অনু-পরমানু পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ অনুভব করে। অর্থ্যাৎ দু'টো বিচ্ছিন্ন পরমানু একে অপরকে আকর্ষণ করে। সেই একইভাবে মাধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষণের ফলেই গোটা বিশ্ব ও নানা পদার্থ তাদের নিজস্ব কক্ষপথে আবর্তিত হয়ে চলেছে। একে অপরের মধ্যে প্রবল আকর্ষণের ফলে কেউই তার জায়গা থেকে ছিটকে পরছে না। পৃথিবী তার আপন গতিতে এগিয়ে চলেছে। জীবজগতের মাঝে যে প্রেমাকর্ষণ রয়েছে; তার স্বরূপ কিছুটা ভিন্ন। কোনোটা দুনিয়াবি প্রেম; আর কোনোটা অপার্থিব। মানবজাতি একে অপরের সাথে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েই পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। এই প্রেম দু' ধরনের। যেমন: স্রষ্টার প্রতি প্রেম এবং পার্থিব জগতের মানুষের প্রতি

প্রেম। দু'টোই রূহের আকর্ষণের মাধ্যমে সৃষ্ট। একটা জীব অপর একটি জীবের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করে প্রেমের কারণেই। এই প্রেম প্রদর্শনের ফলেই পৃথিবীতে শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রয়েছে। তারা পরস্পর যদি প্রেমের বাঁধনে আবদ্ধ না হত, তাহলে গোটা পৃথিবীটা কর্কশ-কণ্টকময় হয়ে উঠত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন-

"জীবে দয়া করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

এই বক্তব্যের মর্মার্থ হল: যে ব্যক্তি (জীব) অপর জীবের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াপরবশ হবে, সেই ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার সেবা করার সমতুল্য পূণ্য অর্জন করবে।

সুফি কবি সাদি সিরাজি'র বনী আদম কবিতার মাধ্যমে এই একই মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছে; যে বক্তব্য গোটা বিশ্বে চিরভাস্বর হয়ে আছে।

মানবজাতি পৃথিবীতে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে পদার্পণ করেছে। তার মাঝে সৃষ্টিকর্তা যাবতীয় সুকুমার বৃত্তির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। মানবাত্মা পরম স্রষ্টার সাথে মিলিত হতে সর্বদা উন্মুখ থাকে। অন্তরের পঙ্কিলতা দূর করে নির্মল হৃদয়ে খোদার সান্নিধ্য লাভে বান্দা প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালায়। পার্থিব ভোগ-বিলাস, লোভ-লালসা ত্যাগ করে নিজেকে পুত-পবিত্র করে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। স্রষ্টা পৃথিবীতে ভোগ বিলাসের বস্তু হিসেবে নানা বিচিত্র অনুষঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। যা মানবজাতিকে পার্থিব জগতে মগ্ন করে রাখে। দুনিয়াবি নেশায় মত্ত বান্দা নিজের নফস্‌কে দমন করতে অপারগ হলে, ধীরে ধীরে স্রষ্টার সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, যা কখনোই কাম্য নয়। দুনিয়াবি মোহমায়া ত্যাগ করে গভীর নিষ্ঠার সাথে স্রষ্টার আরাধনাই একজন খাটি বান্দার ধর্ম। তবে এ মাটির পৃথিবীতে মানুষের কিছু পার্থিব দায়িত্ব-কর্তব্য থাকে। সেগুলোর প্রতি অনীহা প্রদর্শন করাও একজন প্রকৃত মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে মানবজাতিকে কিছু কর্ম সম্পাদন করতে হয়; যা তার পাপ-পূণ্যকে নির্দেশ করে। কর্মের মাধ্যমে একজন মানুষ নিজের অবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম। জীবজগত স্রষ্টার হাতের ক্রীড়নক মাত্র। স্রষ্টার নির্দেশেই সবকিছু পরিচালিত হয়। তবে জীব সৃষ্টির সময় স্রষ্টা তার মাঝে বিবেক ও বুদ্ধির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তাই মানবজাতি নিজের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। সেই সাথে ঐ একই কর্ম তাকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দেয়। নফস্‌কে দমন করতে পারলে একজন মানুষ স্রষ্টার একান্ত সান্নিধ্য অনুভব করতে পারে। আর অন্যথা ঘটলে সে পার্থিব জগতের বেড়াজালে জড়িয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।

একজন ধার্মিক মানুষ কখনোই পথভ্রষ্টতাকে বেছে নেন না। কারণ, সেই মানুষের অন্তরে স্বয়ং স্রষ্টা অবস্থান করেন। সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতি কেবল ঐ ব্যক্তিই অনুধাবন করতে পারে, যে মানুষের হৃদয়ে পঙ্কিলতা-

নিষ্ঠুরতা যত কম; সেই হৃদয়ে স্রষ্টার আবাস তত পোক্ত। পাপকাজ মানুষকে স্রষ্টার সান্নিধ্য থেকে বহু ক্রোশ দূরে নিয়ে যায়। অপরদিকে ভালকাজ ও সততা মানুষের হৃদয়ে প্রশান্তির ছোঁয়া এনে দেয়।

নাস্তিকেরা কখনোই পরম স্রষ্টাকে অনুভব করতে পারে না। কারণ, তারা এই অপার্থিব অনুভূতিকে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে বিচার করে। স্রষ্টাকে অনুভব করতে হলে, হৃদয়কে করতে হবে পবিত্র ও জঞ্জালমুক্ত। সন্দেহ ও তর্কের মাঝে জড়িয়ে সেই মহান সত্ত্বার খোঁজ পাওয়া দুরূহ। কোন পরীক্ষাগারেই স্রষ্টাকে অনুভব করার যন্ত্র নেই। সেই যন্ত্র আছে কেবল মুমিন বান্দার অন্তরে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন-

قل ان كنتم تحبون الله فاتّبعونى يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم و الله غفور رحيم

"বলুন (তাদেরকে) যদি তোমরা আল্লহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর"। (সূরা আল- ইমরান: ৩১)

অন্য আয়াতে এসেছে,

আল্লাহ পাক বলেছেন-

و الذين امنوا اشدّ حباً للهِ

"যারা বিশ্বাস করে, আল্লাহর প্রতি রয়েছে তাদের অফুরান ভালবাসা।" (সূরা বাক্বারা: ১৬৫)

সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের বিচার করতে ইরানের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মুস্তাফা মাস্তর (জন্ম: ১৯৬৪) অসাধারণ এক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন - "যে পরিমাণে তুমি খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তোমার কাছে খোদার অস্তিত্ব সেই পরিমাণেরই হবে। তাঁর প্রতি বিশ্বাস যত বেশি হবে; তাঁর (খোদার) অস্তিত্বের উপস্থিতিও ততটাই বেশি হবে।" (মুস্তাফা মাস্তর, ২০১৪: ৭৬-৭৭)

একথা দ্বারা স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ তার স্রষ্টার উপর ততটাই বিশ্বাসী হবে; যতটা তার অন্তর তাকে অনুমতি দেবে। মাস্তরের বক্তব্য সাধারণভাবে বিচার করলে অত্যন্ত সহজ বলে প্রতীয়মান হয়। তবে এর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ততটা সহজ নয়। বিশেষ করে কোন স্রষ্টায় অবিশ্বাসী মানুষ কখনোই এ বক্তব্যের ভাবার্থ অনুধাবন করতে পারবে না। সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকে মানবত্মা ও পরমাত্মা একে অপরের প্রতি গভীর ভালবাসার টানেই নিজেদের অস্তিত্বে টিকে আছে।

বিখ্যাত ফারসি কবি কায়সার আমিনপুর তাঁর অসাধারণ কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রেমময় সম্পর্ককে।

তাঁর কাব্যে তিনি বলেছেন-

من از عهد آدم تو را دوست دارم

از اغاز عالم تو را دوست دارم

“মান আয আহ্‌দে অ’দাম তু’রা’ দুস্ত দ’রাম

আয অ’গা’যে অ’লাম তু’রা’ দুস্ত দ’রাম”।

অর্থ:

আদম সৃষ্টির সময় থেকে আমি তোমায় ভালবাসি।

সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতেই আমি তোমায় ভালবাসি।

পরম স্রষ্টা যেমন অপার মায়া ও ভালবাসায় মানব তথা সমগ্র জীব জগত সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনি সমস্ত জীব তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় নতমস্তক হয়ে থাকে। এই কৃতজ্ঞতার মাঝে রয়েছে স্রষ্টার প্রতি গভীর ভালবাসা ও প্রেম। বান্দার প্রতি সৃষ্টিকর্তার অপার ভালবাসার নিদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে নিম্নোক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায়।

আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

“আমাকে আমার বান্দা যেভাবে ধারণা করে আমি (তার জন্য) সে রকম। যখন সে আমাকে মনে করে সে সময় আমি তার সঙ্গেই থাকি। সুতরাং সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করলে, আমি ও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আমাকে সে মজলিসে স্মরণ করলে আমি ও তাকে তাদের চাইতে ভাল মজলিসে (ফেরেশতাদের মজলিসে) মনে করি। সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে এলে আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে একহাত এগিয়ে আসে, তবে তার দিকে আমি একবাহু এগিয়ে যাই। সে আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হলে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই”। (সহীহ ইবনুল মাজাহ: ৩৮২২)

স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক এমনই। যা কেবল মুমিন বান্দা অনুভব করতে সক্ষম।

২য় পরিচ্ছেদ

রুমির প্রেমতত্ত্ব

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি অধ্যাত্মবাদের প্রবাদ পুরুষ। রুমির আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান ও খোদা প্রেমের স্বরূপ একটি ব্যাপক আলোচিত বিষয়। রুমির প্রেমদর্শন সম্পর্কে আলোচনা শুরুর পূর্বে কিছুটা সংক্ষিপ্ত পরিসরে "প্রেম" বিষয়টির সাথে পরিচিত হওয়া যাক।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে শুরু করে প্রেম শব্দটি মানুষের মননে অন্তহীন কৌতূহল সৃষ্টি করে আসছে। সমাজ-সভ্যতা ধ্বংস ও বিনির্মাণে প্রেম এক অভিনব বিষয়। প্রেম শব্দটির রয়েছে নানা ধরণ ও বিচিত্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। প্রেম এমন এক শাশ্বত মানবিক বৃত্তি, যা মানুষ জীবনের সূচনা কাল থেকে সহজাতভাবেই অর্জন করেছে। (ভট্টাচার্য, ১৯৫৭: ১৬৩)

প্রেম শুধু নর-নারীর জৈবিক আকর্ষণের বিষয় নয়; বরং এতে রয়েছে বহুমূখী ধরণ ও প্রকৃতি। প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় নানাভাবে। এর পরিচয় দিতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে, মানুষ যে ভাবানুভূতির মাধ্যমে অপরকে আপন করে নেয়, তাই প্রেম। (কাসিমপুরি, ১৯৭৩: ৭)

মানব সৃষ্টির মূলে রয়েছে প্রেম। সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও আধ্যাত্মিক চেতনার দিক থেকে প্রেম সর্ম্পকে নানা মন্তব্য করা হয়েছে। প্রেম হল অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি কোন ভালোবাসার অনুভূতি বা কোন দৃঢ় আকর্ষণ। প্রেমাত্মক ভালোবাসার আবেগ-অনুভূতিগুলো যৌন আকর্ষণের সাথে সম্পর্কিত। তবে এ আকর্ষণ ছাড়াও ভিন্নার্থক প্রেমানুভূতিরও অস্তিত্ব রয়েছে। প্রেম শব্দটির কিছু সমার্থক শব্দ রয়েছে। যেমন: ভালোবাসা, প্রণয়, অনুরাগ, ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, মমতা, অন্তরের ভাববন্ধন ইত্যাদি। প্রেম শব্দটি ইংরেজিতে Love, আরবিতে মহব্বত ও ফারসিতে এশ্ক নামে পরিচিত।

প্রেম হল ভালোবাসার সাথে সম্পর্কিত একটি রহস্যময় অনুভূতি। নর-নারীর পারস্পারিক সম্পর্কের সর্বাপেক্ষা তীব্র ও কেন্দ্রীভূত আবেগময় মানসিক অবস্থাই প্রেম।

Love encompasses a range of strong and Positive emotional and mental states, from the most sublime virtue or good habit, the deepest interpersonal attention, to the simplest pleasure. (Wikipedia)

আরও একটি সংজ্ঞা দ্বারা প্রেম বিষয়টি তুলে ধরা হলো:

Love is a mixture of emotions, behaviors, beliefs associated with strong feelings, constant affection, Protectiveness, warmth and respect for another person. Love can also be used to apply to non-human animals, to some principals and to religious belief. (Good therapy)

মনোবিজ্ঞানী চার্লস লিন্ডসহোমের সঙ্গানুযায়ী প্রেম হল "একটি প্রবল আকর্ষণ যা কোন যৌন আবেদনময় দৃষ্টিকোণ হতে কাউকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরে এবং যাতে তা ভবিষ্যতে দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার মনোবাসনাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রেমের সম্পর্কে যৌনতার তুলনায় ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি অধিকতর গুরুত্বের অধিকারী হয়। (Smith, 2001: 129-151)

প্রেমকে নানা ঢঙে ও বিচিত্র রঙে রাঙিয়ে লেখক ও কবি সাহিত্যিকেরা তাঁদের মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। তাঁরা একেকজন প্রেমকে নানা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছেন।

বিহারী লাল চক্রবর্তী বলেছেন-

"সবই কি ভুল ? তবে কি সকলি ভুল ? নাই কি প্রেমের মূল ?

আবার কখনও তিনি প্রেমিকাকে কাছে না পেয়ে ব্যর্থ পরিণতি দেখে হতাশার সুরে বলেছেন-

কিছুতেই যখন তোমারে না পেলাম, একেবারে আমি যেন কি হয়ে গেলাম।"

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন-

"তাকেই বলে প্রেম যখন না থাকে Future এর চিন্তা, নাহি থাকে Shame,"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কখন কে ধরা পড়ে কে জানে।

শরম ছুটে হায়, গরম টুটে যায়, সলিল বহে যায় দু'নয়নে।"

প্রেম বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। যেমন: প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম, বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানের প্রেম, বাবা-মায়ের সন্তানের প্রতি মমতা, বন্ধুত্বের সম্পর্কে একে অপরের প্রতি স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন, জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেম, এরফানি প্রেম প্রভৃতি। খোদা প্রেমে মত্ত হয়ে বান্দার বাহ্যিক চোখের পর্দা সরে গিয়ে অর্ন্তচক্ষু উম্মোচিত হয়। আর এভাবেই বান্দা স্রষ্টার প্রকৃত পরিচয় অনুভব করে।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেম একটি মনস্তাত্বিক বিষয়। এটি মূলত যুক্তিহীন। যা অদ্ভুত কিছু আবেগ-অনুভূতির উদ্ভব ঘটায়। প্রেম কখনো কখনো শারীরবৃত্তীয় ও নফস্ কেন্দ্রিয় হয়। আবার কখনো তা মানবিক

প্রেম থেকে অনেক উর্দ্ধে অবস্থান করে। ব্যক্তিভেদে প্রেমের বহিঃপ্রকাশও নানাবিধ হয়। বলা হয়ে থাকে যে, প্রেম কোন কিছু প্রাপ্তির এমন এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা যার মাধ্যমে আশেক ও মাশুকের উৎপত্তি হয়। প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে। ফারসি ভাষার প্রথিতযশা কবি নিজামি গাঞ্জুভি প্রেম সর্ম্পকে বলেছেন-

عشق آیینهٔ بلند نور است

شهوت، ز حساب عشق دور است

এশক অ'ইনেয়ে বুলান্দে নুর আস্ত

শাহওয়াত, যে হেসা'ব এশক দূর আস্ত।

বঙ্গায়নঃ

প্রেম হলো নূরের এক প্রশস্ত আয়না

লালসা প্রেমের সাথে মোটেই যায়না।

প্রেম এবং মাশুক সমানুপাতিক স্থানে অবস্থিত ও একে অপরের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত। একজন প্রকৃত প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের প্রতি নিষ্কলুষ ও খাঁটি প্রেম নিবেদন করেন, যা পার্থিব লোভ লালসামুক্ত।

আল্লামা ইকবাল লাহোরি প্রেম সর্ম্পকে বলেছেন–

عشق رُسوا گشت از فریادشان

زشت رو تمثالش از بهزادشان

এশক রোসভা গাশত আয ফারইয়াদে শান

যেশতে রু তামসালেশ আয বেহযাদে শান ।

(রায্মজু, ১৩৮২ হি.শা: ৮৭-৯২)

অর্থ:

তাদের আর্তনাদে প্রেম (আজ) সম্মানহীন হয়ে পড়েছে,

তাদের অভিজাত সন্তানদের মূর্ত-অবয়ব কুৎসিত রূপ ধারণ করেছে।

অধ্যাত্ম প্রেমের বিষয়টি এসেছে মূলত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে প্রেম সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পাওয়া যায়। প্রেম সংঘটিত হয় মানবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে। তাই বলা হয়েছে- যে

আকর্ষণে মানবাত্মা তার উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চায়, সেই আকর্ষণকে বলে ঐশী প্রেম। মানবাত্মার প্রেমের উৎস হলো পরম প্রেমময় স্রষ্টা। সৃষ্টিকর্তার গুণবাচক নাম হলো "আল ওয়াদূদ"। যার অর্থ প্রেমময়।

Dr. Reynold A. Nicholson এর মতে, প্রেম হল সকল ধর্মীয় মতবাদের নির্যাস। তিনি বলেন- "Love is the essence of all creeds". (Nicholson,1966: 105)

সুফিদর্শনের মূলভিত্তি হলো প্রেমবাদ। এই প্রেমের সম্পর্কে প্রেমিক হলো মানুষ আর প্রেমাস্পদ হলো আল্লাহ বা পরমাত্মা। প্রেম মূলত দুই ভাগে বিভক্ত। ঐশী প্রেম ও জাগতিক প্রেম। ঐশী প্রেম (এশ্‌কে হাক্বিকি) আর জাগতিক প্রেম (এশ্‌কে মাজাযি)। ঐশী প্রেমের মাধ্যমে মানবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়। আর অন্য সব প্রেম জাগতিক বা বাহ্যিক প্রেম বলেই বিবেচ্য।

হামে তো বান্দেগি সে মাতলাব হ্যা

হাম সাওয়াব অর আযাব ক্যায়া জানে?

কিস্‌মে কিতনা সাওয়াব মিলতা হ্যা;

এশ্‌ক ওয়ালে হিসাব ক্যায়া জানে?

প্রকৃত প্রেমিক যারা, তারা কখনোই পাপ-পূণ্য, লাভ-ক্ষতির হিসাব করেনা। তারা শুধু স্রষ্টার আরাধনায় মশগুল থাকে।

The era we are living in, mosques are desolated and clubs are populated. Moral values are no more and human lust is at its peak. All our efforts end up with fulfilling the appetite of the Nafs.

Some casual differences between Eshq-e-Haqiqi and Eshq-e-Majazi are described below:

In Eshq-e-Majazi (in a person's love) there are desperate and intense feelings. While in Eshq-e-Haqiqi (in Allah's love) there is peace and tranquility.

We wait hours and days for the one we love but on the other hand, we have Allah near us all the time.

If we put forward one step to Allah, He comes 100 steps to us.

In a person's love, there is anxiety, sleepless nights, occupied minds, restless life whereas in Allah's love there is calmness and relief.

A person who loves the creator, is drunk in Allah's love. He sees what other people can't see. He hears what other people don't hear. And all that he desires is the happiness of Allah. So its far better to look forward the real love for the Almighty. (facebook.com)

যারা প্রকৃতই আল্লাহ প্রেমিক, তারা যা কিছুই করেন; আল্লাহর প্রেমের জন্যেই করেন।

পবিত্র কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে-

و يطعمون الطعام على حبه مسكيناً و يتيماً و اسيراً- انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً و لا شكورًا

"আর তারা আল্লাহ্‌র প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। (তারা বলে) কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোনরূপ প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না"। (সুরা আদ-দাহর: ৮-৯)

পবিত্র হাদিস শরিফে ঐশী প্রেম ও জাগতিক প্রেমের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহকে ভালবাসতে এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসা পেতে হলে একজন বান্দাকে আল্লাহর রাসূলকে (সা.) অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র হাদিস শরিফে এসেছে-

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده و ولده و الناس اجمعين

"তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে প্রিয়পাত্র না হব।" (ইসমাঈল, বুখারি: ৭)

রুমির দৃষ্টিতে প্রেম হলো সকল রোগের মহৌষধ। তাঁকে প্রেমের কবি বলা হয়। তাঁর মতে, এই সৃষ্টি জগতের মূলে রয়েছে ঐশী প্রেম। আর সমগ্র সৃষ্টি জগতেই এই মহৎ প্রেম বিরাজমান। ঐশী প্রেম চিরস্থায়ী। আর বাহ্যিক বস্তুগত প্রেম অস্থায়ী।

রুমির ভাষায়-

گر نبودی بهر عشق پاک را

کی وجودی دادمی افلاک را

"গার না বুদি বেহার এশক্ পা'ক রা'

কেই উজুদি দ'দামি আফলা'ক রা' ।

(রুমি, ১৯৩৯: ৮৪৯)

অর্থ:

যদি পবিত্র প্রেমের তরে না হতো,

তবে কি সৃষ্টি করতাম এই আকাশসমূহ?

তিনি আরও বলেন-

از محبت تلخ ها شیرین شود

از محبت مس ها زرین شود

"আয মুহাব্বাত তালখ্হা' শিরিন শাভাদ

আয মুহাব্বাত মেসহা' যাররিন শাভাদ। (রুমি, ১৯৩৯: ২৩৯)

অর্থ:

মহব্বতে তিক্ততা মধুর হয়ে যায়

মহব্বতে পিতলও স্বর্ণ হয়ে যায়।

রুমির মতে, প্রেম মানবজাতির বৈশিষ্ট্য এবং শয়তান প্রেমের দুনিয়ার পথ কোনদিন খুঁজেই পায়নি। প্রেম নাজাতের দুনিয়ায় নিয়ে যায়। আশেক ঐশী প্রেমকে প্রতি মূহুর্তে অনুভব করে। আর এই প্রেম যাবতীয় চিন্তা ও আরাধনার ঊর্দ্ধে। (দরূদগারিয়ান, ১৩৯২হি.শা: ১৩২-১৩৩)

রুমি প্রেমের মর্ত্যে একজন সুফি। তাঁর ভাষ্য মতে, যে প্রেমিক খোদার প্রেমে পতিত হয়ে; তার যাবতীয় চিন্তা দূরীভূত হয়। স্রষ্টা ব্যতীত আর কারো সাথেই তার আত্মিক সম্পর্ক থাকে না। (Barks, 2003: introduction xxi-xxii)

রুমির দ্বিপদী কাব্য মাসনাভির মূল বিষয় ঐশী প্রেম এবং মাসনাভি শরীফ ঐশী প্রেমের ভাণ্ডার। তিনি প্রেমকে ব্যবহার করেছেন অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মিক নীতি হিসেবে। পবিত্র কুরআনে বিধৃত প্রেমের ধারণাকে ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

শামস তাবরিযির আগমন রুমির জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়। এই জ্ঞানতাপস রুমির কাছে প্রেমের মহাসম্পদ তুল্য। প্রেম আল্লাহর সত্তার নির্যাস। সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির মূল কারণ। রুমি প্রেমের শক্তি সম্পর্কে বলেছেন,

جسم خاک از عشق افلاک شد

کوه در رقص آمد و چالاک شد

"জেস্‌ম খা'ক আয এশ্‌ক বার আফলা'ক শোদ

কুহ দার রাক্‌স অমাদ ও চা'লা'ক শোদ" । (রুমি, ১৯৩৯: ৬)

অর্থ:

প্রেমের কারণে মাটির দেহ ঊর্ধ্বাকাশে পাড়ি দিল।

পবর্তও চঞ্চল হয়ে নৃত্য করল।

মাটির দেহ ঊর্ধ্বাকাশে পাড়ি দেওয়া বলতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মেরাজে যাওয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অপরদিকে পর্বতের চাঞ্চল্য ও নৃত্য বলতে আল্লাহর নূরের তাজাল্লিতে মূসা (আ.) ও তুর পর্বতের কম্পমান হওয়ার ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সূরা আরাফে এই ঘটনার কথা বলা হয়েছে। জালালুদ্দিন রুমির স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে তাঁর বক্তব্যে। রুমির প্রেমদর্শন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে আপন দ্যুতি।

রুমির বক্তব্যের সারবস্তু-

Love's Nationality is separate from all other religions,

The lover's religion and nationality is the beloved (God).

The lover's cause is separate from all other causes,

Love is the astrolabe of God's mysteries.

রুমির মতে ঐশী প্রেম হলো পবিত্র ও নিঃস্বার্থ প্রেম। জালালুদ্দিন রুমি বলেন, জগতের সবকিছুই প্রেমাস্পদ এবং প্রেমিক আবরণ ও প্রপঞ্চ মাত্র, প্রেমাস্পদ চিরকাল জীবিত থাকে তবে প্রেমিকের মৃত্যু ঘটে। প্রেমদর্শন রুমির জীবনের মূল দর্শন। (বাহাউদ্দিন, ২০১৯: ৭৮-৭৯)

রুমির এই প্রেমদর্শন গোটা বিশ্বে; কী প্রাচ্য কী প্রতীচ্য সর্বস্তরে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। আজকের বর্তমান বিশ্বে যে অশান্ত ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ বিদ্যমান; তা কখনোই কাম্য নয়। রুমির এই প্রেমের বাণীকে অমিয় বাণী হিসেবে মানব সমাজ সাদরে গ্রহণ করেছে।

তথ্যসূত্র

আল কুরআনঃ

১. সূরা আল্ ইমরান, আয়াত-৩১;

২. সূরা আল্ বাক্বারা, আয়াত-১৬৫;

৩. সূরা আদ্ দাহর, আয়াত- (৮,৯);

৪. সহীহ ইবনুল মাজাহ (৩৮২২), বুখারী ও মুসলিম;

বাংলা গ্রন্থসমূহঃ

১. মুস্তাফা মাস্তুর, শাকির সবুর (অনুবাদ) (২০১৪)। *খোদার চাঁদমুখে চুমু খাও*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা;

২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, (১৯৫৭)। *বাংলার লোকসাহিত্য*, কলকাতা;

৩. কাসিমপুরি, সিরাজউদ্দিন (১৯৭৩)।*বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিত*, বাংলা একডেমি, ঢাকা;

৪. মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, দেওবন্দ: আশরাফিয়া বুক ডিপো, তা. বি. ;

৫. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন (২০১৯)। *প্রেম ও প্রজ্ঞার বাহক রুমি*, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা;

ফারসি গ্রন্থসমূহঃ

১. রুমি, মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দিন (১৯৩৯)। *মাসনাবীয়ে মা'নাবী*, ৫ম খণ্ড, লাক্ষ্ণৌ: মাতবায়ে মুনশী নওল কিশোর;

২. প্রাগুক্ত, *মাসনাবীয়ে মা'নাবী*, ১ম খণ্ড;

৩. দরূদগারিয়ান, ফরহাদ (১৩৯২)। *তাকা'বেলে এশক্ ও আক্ল দার মাসনাভি*, জয়তুন সাব্জ প্রকাশ, তেহরান;

৪. প্রাগুক্ত, *মাসনাবীয়ে মা'নাবী*, ১ম খণ্ড, বেইত নং ২৫;

৫. রাযম্জু, ডক্টর হোসাইন (১৩৮২)। *নাকদ ও নাযারি বার শেওে গোযাশতেয়ে ফারসি আয দিদগাহে আখলাক এসলামি*, দানেশগাহে ফেরদৌসি, মাশহাদ;

ইংরেজি গ্রন্থসমূহঃ

১. Barks, Cloeman (Translation) (2003). *Rumi: THE BOOK OF LOVE: Poems of Ecstasy and Longing*, Harper Collins Publishers, New York;

২. Smith, D.J (2001). *Romance, parenthood and gender in a modern African Society,* Ethnology;

৩. Dr. R.A. Nicholson (1966). *The Mystics of Islam,* London: Routledge And Kegan Paul Ltd;

Web Address:

1. https://www.goodtherapy.com;
2. https://m.facebook.com;
3. https://www.wikipedia.com.

চতুর্থ অধ্যায়

মাসনাভি পরিচিতি

১ম পরিচ্ছেদ - দ্বিপদী কাব্য মাসনাভির পরিচয়, উৎস, প্রেক্ষাপট, বিষয়বস্তু

২য় পরিচ্ছেদ - মাসনাভির সামাজিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি

৩য় পরিচ্ছেদ - সাহিত্যের মানদণ্ডে মাসনাভির অবস্থান

৪র্থ পরিচ্ছেদ - মাসনাভির গ্রহণযোগ্যতা, গুরুত্ব ও প্রভাব

১ম পরিচ্ছেদ

দ্বিপদী কাব্য মাসনাভির পরিচয়, উৎস, প্রেক্ষাপট, বিষয়বস্তু

মাসনাভি কাব্য জগতের এক অমূল্য সম্পদ। এই মাসনাভি দুই লাইনযুক্ত একটি বিশেষ ধারার কবিতা যার উভয় চরণে অন্তমিল থাকবে। মাসনাভি (مثنوی) একটি আরবি শব্দ। যার অর্থ ইংরেজিতে Couplet Poem এবং বাংলায় দ্বিপদী কবিতা। এ শব্দটির মূল হচ্ছে : ثنوی /الثنای

মাসনাভি শব্দের অর্থ যুগল, জোড়া, দ্বৈত, দ্বৈতবাদী ইত্যাদি। আর এ শব্দগুলোর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Dyad, dual, duality, dualist, dualistic. এ শব্দগুলোর উৎপত্তি হয়েছে (ثنوی، الثنوی، ثنویت، ثنویاتی) শব্দগুলো থেকে। মাসনাভি বা দ্বিপদী ছন্দের কবিতার মাধ্যমে সাধারণত বিস্তারিত কোনো ঘটনা বর্ণনা করা হয়।

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির এক অনবদ্য সাহিত্যকর্ম হচ্ছে মাসনাভি। এটি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এক অলঙ্কারপূর্ণ জ্ঞানকোষ হিসেবে বিবেচিত হয়। যা মানবিকতা ও অধ্যাত্মবাদের শিক্ষা দেয়। রুমি তাঁর মাসনাভিকে ধর্মের মূল, বিশ্বজগত ও ঐশ্বরিক জ্ঞানের গোপন রহস্য উন্মোচক হিসেবে সঙ্গায়িত করেছেন। এই অমর কাব্য মানুষের সাথে মানুষের এবং স্রষ্টার সাথে গোটা বিশ্বের সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। রুমি এমন এক মণীষী; যিনি মানবীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিপুণ বিষয়গুলোর সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। রুমির মাসনাভি যেন সত্যের পরশ পাথর, যার ছোঁয়া পেতে পুরো মানবজগত অনন্তকাল ধরে সচেষ্ট রয়েছে।

মাসনাভি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মহাসম্পদ, যা মানবসমাজকে আশা ও বিশ্বাসের বার্তা দেয়। ঐশ্বরিক পথনির্দেশনার মাধ্যমে পুরো মানবজাতিকে সংশোধনের পথ দেখায়। রুমি তাঁর মাসনাভিতে অন্তরের মলিনতা দূরীভূত করার আহ্বান জানিয়েছেন বারংবার। অন্তরের পঙ্কিলতা দূর হলে যাবতীয় স্বার্থপরতা ও পার্থিব আকাঙ্ক্ষা থেকে মানবহৃদয় মুক্ত হয়। আর তখন সেই মুক্ত হৃদয়ের দর্পণে প্রতিফলিত হয় পরম সত্যের প্রতিফলন। মাওলানা রুমির মাসনাভি হল কুরআনের প্রতিচ্ছবি, সত্যের পরশ পাথর। যার জীবন্ত ও শক্তিশালী বার্তা প্রায় আটশত বছর পরে মানবসমাজ আজও অন্বেষণ করে চলেছে।

একজন প্রখ্যাত রুমি গবেষক সিমা আরিফ রুমির মাসনাভি সম্পর্কে লিখেছেন-

Mevlana Jalal-Ud-Din Rumi's Masnavi is the "mirror", a tool gifted to mankind to adorn not only personal selves but beautify their souls in harmony to divine principles taught by Qur'an and practiced to perfection by Hazrat Muhammad (Saw) (Arif, 2008: 91,93,103)

রুমি এমন একজন মানুষ, যিনি মানব হৃদয়ের মৌলিক যাতনা ও কষ্টের প্রকৃত কারণ ব্যক্ত করেছেন তাঁর কাব্যচেতনার মাধ্যমে। তাঁর মতে, এই বেদনা পরমাত্মা থেকে আত্মার বিচ্ছেদ ও পুনরায় সেই ঐশ্বরিক সত্যের সাথে মিলিত হওয়ার আকুল আকাঙ্ক্ষা থেকেই উৎসারিত। আত্মার নিজস্ব গন্তব্যে প্রত্যাবর্তনের এই আকুলতা রুমির মাসনাভির প্রথমাংশে পরিস্ফুট হয়েছে। মাওলানার ধারণা মতে, বাঁশির সুর মানব হৃদয়ের গভীর আর্তনাদের ন্যায়। এই সুর মাসনাভি পাঠকদের যেন এক কল্পনার জগতে নিয়ে যায়। বাঁশিকে বেণুবন থেকে বিচ্ছিন্ন করায় তার যে করুণ আর্তনাদ এবং সেই মূল অস্তিত্বে ফিরে যাবার যে ব্যাকুলতা তা পাঠক হৃদয় খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারে। আত্মার জগত হতে রূহ এই মর্ত্যলোকে আগমনের পর থেকেই তার প্রকৃত স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে ব্যাকুল থাকে। রুমি এই আকুলতাকেই বাঁশির করুণ আর্তনাদের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। (Erguvan, 2008: 124)

মাওলানা রুমির বিস্ময়কর সাহিত্যকর্ম হল মাসনাভি। ইসলামি সুফিচেতনা সমৃদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে রুমি এই আধ্যাত্মিক মহা-গ্রন্থের রচনা করেছেন; যা বিশ্ব সাহিত্য দরবারে অনন্য। এই মাসনাভি রুমির জীবনের এক রুহানি সফরনামার ন্যায়; যে সফরনামায় রুমি নিজের জীবনে অর্জিত সুফিয়ানা অভিজ্ঞতাগুলোর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। রুমি মাসনাভির সূচনাংশে বংশীনামা'র ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই বংশীনামায় বাঁশির রূপক বর্ণনায় মানব হৃদয়ের করুণ সুর ঝংকৃত হয়েছে। (দরূদগারিয়ান, ১৩৯২হি.শা : ১৭০-১৭১)

বাঁশির এই সুর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়, কোন মৃদুমন্দ সমীরণ নয়। এই আগুন যার হৃদয়ে নেই, তার মৃত্যুই শ্রেয়। বাঁশির আর্তনাদের অগ্নিতে প্রেমিক নিজে দগ্ধ হয় আর অন্যদেরও দগ্ধীভূত করে। (আহমাদ, ২০১৫: ৯৩)

সুফি কবি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি কর্তৃক ফারসি ভাষায় রচিত বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ মাসনাভি শরিফ। ফারসি একে তো মিষ্টি-মধুর সুললিত ভাষা, উপরন্তু এ ভাষার কবিতাগুচ্ছ হৃদয়স্পর্শী ছন্দে বিরচিত। মাসনাভির হৃদয়হারী ছন্দের ঝঙ্কার ও ভাবের তরঙ্গে পাঠকের হৃদয়-মন তন্ময় হয়, দেহ-মন আপন অস্তিত্ব হারিয়ে পরমাত্মার অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যায়।

রুমি একজন ভাবকবি। তাঁর কাব্য শান্তিরসের এক অবারিত ধারা। মাসনাভির ভাব বেশ জটিল; পাঠক যদি ধারাবাহিকভাবে তা পাঠ না করে তবে এর ভাবার্থ অনুধাবন করা অনেকটাই দুরূহ হয়ে পড়ে। (ওয়াহেদ, ১৯২৪ : ভূমিকা)

মাসনাভি শরিফ ধর্মীয় কোন শাস্ত্র নয়, তবে নিঃসন্দেহে এটি একটি পবিত্র সাহিত্য। বলা হয়ে থাকে যে, কুরআন ও হাদিস ভালো জানা না থাকলে রুমির লেখা অনুধাবন করা দুঃসাধ্য। মাসনাভি সম্পর্কে একটি কথা প্রচলিত আছে যে,

حضرت مثنوی کتابست

مشکل تر از مشکل آسان تر آز آسان

این بر عاقلان آن بر جاهلان

"হযরত মাসনাভি কিতাবাস্ত

মুশকিলতার আয মুশকিল

আসানতার আয আসান

ইনবার আকেলান অনবার জাহেলান"।

"Mathsnavi Sharif is a book which is harder than the hard and easier than the easy. The first, is to the wise and the second is to one who lacks in understanding."

"মাসনাভি শরিফ এমন একটি গ্রন্থ যা কঠিন থেকে কঠিনতর এবং সহজ হতে সহজতর। প্রথমটি জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের এবং দ্বিতীয়টি অপরিপক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের উপলব্ধিগত।" (হক, ২০১৩: ৭৩)

মাসনাভির ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল। এটা পাঠ করতে পাঠককে বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে হয় না। মাসনাভির ভাষা সরল হলেও এর ভাবার্থ কিন্তু বেশ কঠিন। এই কাব্যের যদি শাব্দিক অনুবাদ করা হয়, তবে এটা অত্যন্ত দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। আর যদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুবাদ করা হয়, তবে এটা তাফসিরের আকার ধারণ করে।

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আর. এ. নিকলসন (Dr. R.A.Nicholson) মাসনাভির প্রত্যেক লাইনের নম্বর দিয়ে ১৯২৫ সালে মাসনাভিকে ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করেন। আর ১৯৩৬ সালে পৃথকভাবে তিনি এর ব্যাখ্যাও প্রকাশ করেন। (মোনয়েম, ১৯৯৭: ১৩)

ফারসি ভাষায় অগণিত কবি অসংখ্যবার মাসনাভি কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু মাসনাভি বলতে পাঠক হৃদয়ে সর্বাগ্রে মাওলানা রুমির বিখ্যাত মাসনাভি শরিফের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। অন্তরে সেই মোহময় ছন্দ বেজে ওঠে। এই কাব্যের অতুলনীয় গুরুত্ব ও সম্মানের কারণে গ্রন্থটিকে মাসনাভি শরিফ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। শরিফ মানে সম্মানীয়। কুরআন আল্লাহর বাণী। এই পবিত্র আসমানী কিতাবের নামের সাথে শরিফ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তেমনিভাবে রাসূল (সা.) এর বাণী ও পথনির্দেশনা হাদিস শরিফ হিসেবে পরিচিত। একইভাবে মাওলানা রুমি রচিত মাসনাভি কাব্যগ্রন্থটির সাথে শরিফ কথাটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা মাসনাভি মূলত কুরআন ও হাদিসের নির্যাস। মাওলানা রুমির কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে পঞ্চদশ শতাব্দীর স্বনামধন্য সুফি ও আশেকে রাসুল (সা.) কবি আব্দুর রহমান জামি (১৪১৪-১৪৯২ খ্রি:) বলেন-

مثنوی معنوی مولوی

هست قرآن در زبان پهلوی

"মাসনাভিয়ে মানাভিয়ে মাওলাভি

হাস্ত কুরআন দার যাবা'নে পাহলাভি"

বঙ্গায়নঃ

মাওলানা রুমির মাসনাভি যেন,

পাহলভি ভাষায় আল-কুরআনের প্রতিচ্ছবি।

রুমির মাসনাভিকে ফারসি (পাহলভি) ভাষার কুরআন বলা হয়ে থাকে।

পৃথিবীর সত্য ও সৌন্দর্যপ্রিয় প্রতিটি জাতির মাঝে রুমির কবিতা ও তাঁর প্রেমময় বাণী অধ্যয়নের তীব্র আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। রুমির মূল কাব্য মাসনাভি, দিওয়ানে শামসে তাবরিযি, ফিহে মা ফিহ গদ্য সাহিত্যের প্রতিটি দর্শন ও কাহিনী মানবতাবাদ ও মানব-অস্তিত্বের মূল পরিচয় তুলে ধরে। রুমির কাব্যসম্ভারে রয়েছে কুরআন মাজিদ ও মহানবির (সা.) জীবনের অতুলনীয় আধ্যাত্মিক ভাষ্য; যা রুমি নিজস্ব ঢঙে রচনা করে আধ্যাত্মিক মোড়কে উপস্থাপন করেছেন। স্রষ্টাকে পরিপূর্ণরূপে চেনার প্রেমময় পথ প্রদর্শন করেছেন। খোদাপ্রেমের প্রতি গভীর আবেদন পরিলক্ষিত হয় মাসনাভির প্রতিটি পরতে। (খান, ২০০৬: ৪২)

মাসনাভির গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চাইলে সেই ব্যক্তিকে স্রষ্টার প্রতি গভীর অনুরাগী হতে হবে। স্রষ্টার সাথে সম্পর্কের দূরত্ব যদি বেশি থাকে, তবে মাসনাভির তত্ত্বকথা আত্মস্থ করাটা বেশ কষ্টসাধ্যই হবে। যদিও মাসনাভির ভাষা ও বর্ণনা খুবই সহজ ও সাবলীল, যেটা পাঠ করতে পাঠককে খুব একটা বেগ পেতে হয়না, তবে এর নিগূঢ় তত্ত্বকথা নিজের অন্তরে প্রতিস্থাপন করতে চাইলে প্রয়োজন স্রষ্টার সাথে নিবিড় সম্পর্ক।

মাওলানা জালালুদ্দিন তাঁর মাসনাভি কাব্যে কুরআন, হাদিসের তাফসির-ব্যাখ্যা ও নানাবিধ সমস্যার সমাধান দিয়েছেন চমৎকারভাবে। রুমিকে কুরআনের সারবস্তুর সঠিক ব্যাখ্যাকারি হিসেবে অভিহিত করা হয়। শত-সহস্র বছর পূর্বে যে সকল জ্ঞানী-পণ্ডিতেরা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা করেছেন; রুমি তাঁদের প্রত্যেকের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে পরম স্রষ্টা ও রাসূল (সা:) এর হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। যে সমস্যাগুলোর সমাধান কিছুটা জটিল; সেগুলোকে বোধগম্য করে তুলতে তিনি তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভাষাকে করে তুলেছেন প্রেম ও প্রজ্ঞাময়। যেন দুরূহ বিষয়গুলো সহজেই বোধগম্য হয়ে ওঠে। (শাহিদী, ১৩৮০: ৩৪)

রুমির মাঝে প্রেমবাদ ও নবি-অলিদের প্রতি ছিল গভীর ভক্তি। তাঁর রচনায় এই অপরিসীম ভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। আর এই ভক্তির দ্বারা একজন মানুষ প্রকৃত প্রেমিক হয়ে উঠতে পারে। সেই প্রকৃত প্রেমিক স্রষ্টার আলোয় জ্যোতির্মান হয়ে ওঠেন। (আহমাদ, ২০১৫: ৩৩০)

মাসনাভি পরিচিতি

দ্বিপদী কাব্য মাসনাভি বলতে ঐ সকল কবিতাকে বোঝায়, যার প্রতিটি বেঈতের (দুই লাইনের সমষ্টি) উভয় মেসরায় (এক লাইন) একই ছন্দমিল থাকে। এই ছন্দমিল প্রতিটি বেঈতে পরিবর্তিত হয়, তবে ওজন একই থাকে। (Huq, 1927: 103)

এর বিষয়বস্তু আধ্যাত্মিক বা চারিত্রিক নানা গল্প কাহিনীর আঙ্গিকে হতে পারে। মাসনাভির অন্তমিল নিম্নরূপ:

---------- ক ----------ক

---------- খ ----------খ

---------- গ ----------গ

---------- ঘ ---------- ঘ। (তামিমদারি, ২০০৭: ১৯৫)

মাসনাভি যেহেতু গঠনগতভাবে প্রতিটি বেইত ই অন্তমিল বিবেচনায় পৃথক হয়, তাই পঙক্তিগুলোরও পূর্বাপর মিল থাকেনা এবং কবির প্রতি বেইতেই তা পরিবর্তন করার স্বাধীনতা থাকে। আর তাই কখনো তা কয়েক হাজার বেইতের দীর্ঘ কাব্যে পরিণত হতে পারে। আর এ কারণেই এর পূর্ণ ভাবার্থ পরিস্ফুটনে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের দীর্ঘ কাহিনী-কাব্যের অবতারণা হতে পারে।

'ফেরদৌসির *শাহনামা*, আসাদি তুসির *গারশাসবনামেহ*, আত্তারের *মানতেকুত্ তেইর*, সানায়ির *হাদিকাতুল হাক্বিকাহ*, সাদির *বুস্তান*, রুদাকি সামারকান্দির *কালিলা ও দেমনা*, আবু শাকুর

বালখির *অফারিননামে*, নিজামি গাঞ্জুভির *খামসা*, মাওলানা রুমির *মাসনাভিয়ে মানাভি* কে এ ধরনের দীর্ঘ কবিতার অন্যতম উদাহরণ হিসেবে সবিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে।

এ ধরনের মাসনাভির উৎপত্তি ইরানেই হয়েছিল। তৃতীয় শতাব্দীর শেষাংশে মাসুদি মারুজির *শাহনামা* রচনার মধ্য দিয়েই এই মাসনাভি ধারার সূচনা পর্ব বলে মনে করা হয়। মাসনাভি বিভিন্ন ছন্দরীতিতে রচিত হতে পারে। তন্মধ্যে কয়েকটি ছন্দ নিচে তুলে ধরা হল:

১. বাহরে সারি মুসাদ্দেসে মুতাওয়ায়ে মাওকুফ (بحر سريع مسدس مطوى موقوف)

এর ছন্দমিল: مفتعلن مفتعلن فاعلات

২. বাহরে হাজাযে মুসাদ্দেসে মাহযুফ (بحر هزج مسدس محذوف)

এর ছন্দমিল: مفاعيلن مفاعيلن فعولن

৩. বাহরে খাফিফে মুসাদ্দেসে মাকতু (بحر خفيف مسدس مقطوع)

এর ছন্দমিল: فاعلاتن مفاعلن فعلن

৪. বাহরে হাজাযে মুসাদ্দেসে আখরাবে মাহজুফ (بحر هزج مسدس اخرب محذوف)

এর ছন্দমিল: مفعول مفاعلن فعولن

৫. বাহরে রামাল মুসাদ্দেসে মাকসুর ইয়া মাহজুফ (بحر رمل مسدس مقصور يا محذوف)

এর ছন্দমিল: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن يا فاعلات

৬. বাহরে মুতাক্বারেবে মুসাম্মানে মাকসুর ইয়া মাহজুফ (بحر متقارب ثمن مقصور يا محروف)

এর ছন্দমিল: فعولن فعولن فعولن فعل يا فعول

৭. বাহরে মুতাক্বারেবে আসরামে মাকবুজে মুক্বাব্বাহ্ (بحر متقارب اثرم مقبوض مقبح)

এর ছন্দমিল: فاع فعولن فعولن فاع يا فعولن فعولن فعولن فاع

(জাফরি, ১৯৪০: অনু: ২৯,৩০)

তবে ফারসি ভাষার বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকগণ যে ছন্দরীতি তাঁদের মাসনাভি রচনার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন, সেগুলো হলো:

বাহরে মোতাক্বারেব (بحر متقارب)। ছন্দটি নিম্নরূপ:

فعولن فعولن فعولن فعول

ফেরদৌসির *শাহনামা*, আসাদি তুসির *গারশাসবনামেহ*, সাদির *বুস্তান* এ ওজনে রচিত।

আত্তারের *মানতেকুত তেইর*, রুমির *মাসনাভি* বাহরে রামাল (بحر رمل) ছন্দে রচিত। ছন্দটি নিম্নরূপ: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

নিযামি আরুজির *খসরু ওয়া শিরিন*, ফখরুদ্দিন আসাদ গুরগানির *ভিস ওয়া রামিন* এবং জামির ইউসুফ *জুলাইখা* বাহরে হাজায (بحر الهزج) ছন্দে রচিত। ছন্দটি নিম্নরূপ:

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل

ফেরদৌসির *শাহনামার* একটু নমুনা তুলে ধরা হলো:

بنام خداوند جان و خرد
كزين برتر انديشه برنگزرد
خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی ده رهنمای

আত্তারের *মানতেকুত তেইরের* নমুনা:

مرحبا ای هدهد هادی شده
در حقیقت پیک هر وادی شده
آفرین جان آفرین پاک را
آنکه جان بخشید و ایمان خاک را

নিজামি গাঞ্জুভির *খসরু ওয়া শিরিন* থেকে নমুনা:

خداوندا در توفیق بگشای
نظامی را ره تحقیق بنمای
دلی ده کو یقینت را بشاید
زبانی کافرینت را سراید

রুমির *মাসনাভির* কিছু চরণ:

من بهر جمعیتی نالان شدم
جفت بد حالان و خوش حالان شدم
نی حدیث راه پرخون می کند
قصه های عشق مجنون می کند

রুদাকি সামারকান্দি (৮৭৩-৯৪০ খ্রি:) সর্বপ্রথম ফারসি ভাষায় বিখ্যাত গ্রন্থ *কালিলা ওয়া দেমনা'র* মাসনাভি কাব্যরূপ দান করেন। পবরর্তীতে আবু শাকুর বালখি *অফারিননামে* (৯৪৪-৯৪৭ খ্রি.) গ্রন্থটি মাসনাভি কাব্যাকারে রচনা করেন। এর পরে ফারসি ভাষায় আরো অনেক মাসনাভি কাব্য রচিত হয়েছে। ফরিদুদ্দিন আত্তারের *মানতেকুত তেইর*, সানায়ির *হাদিকাতুল হাক্বিকাত*, ফেরদৌসির *শাহনামা*, নিজামির *খামসা* ইত্যাদি।

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি রচিত মাসনাভি শরিফ সুফি সাহিত্যের এক অনবদ্য গ্রন্থ। যে গ্রন্থের প্রসিদ্ধি পারস্য থেকে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে ছড়িয়েছে। আর এর দ্যুতি মূল্যবান কোহিনূরের ন্যায় অত্যুজ্জল। এটি অসাধারণ এক কাব্যগ্রন্থ, যা আল-কুরআনের গূঢ়তত্ত্ব ছন্দাকারে ও অপূর্ব নান্দনিকতায় মানুষের কাছে পৌঁছেছে।

রুমি মাসনাভি সম্পর্কে বলেছেন-

মাসনাভি হল "সেইকেলে আরওয়াহ্" অর্থ্যাৎ অন্তরের মরিচা দূরীকরণ যন্ত্র।

মাসনাভি ফারসি ভাষার বিখ্যাত মরমি কাব্য। এটি বাহরে রামাল (بحر رمل: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) ছন্দ রীতিতে রচিত ।

রুমি এ মহান কাব্যসম্ভার মাসনাভিকে ৬ খণ্ডে রচনা করেছেন। তবে এ বিষয়ে ভিন্ন মত রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, মাসনাভি সাত খণ্ডে রচিত। কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার সিনিয়র আরবি অধ্যাপক মৌলবী আবদুল হামিদ বলেছেন, রুমি ফারসি ভাষায় ৭ খণ্ডে মাসনাভি রচনা করেছেন; যা সবার পক্ষে সহজে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। (ওয়াহেদ, ১৯২৪: অভিমতপত্র: ১১)

এই সপ্তম খণ্ডের রচয়িতা নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এটা রুমি নিজেই রচনা করেছেন। আবার কেউ বলেন যে মাওলানার পুত্র সুলতান ওয়ালাদ এর রচয়িতা। মাসনাভির শ্লোক সংখ্যা নিয়েও নানা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, সমগ্র মাসনাভিতে ৬৬,৬৬০ টি শ্লোক আছে। ঐতিহাসিক আফলাকি বলেন যে, এই ৬৬,৬৬০টি শ্লোক ছাড়াও রুমি আরও প্রায় সহস্র শ্লোক রচনা করেছিলেন। (ওয়াহেদ, ১৯২৪: মাসনাভি রচনাংশ)

অধ্যাপক আর. এ. নিকলসনের মতে, ছয় খণ্ডের পূর্ণাঙ্গ মাসনাভিতে সর্বমোট ২৫,৬৩২ টি পঙক্তি রয়েছে। সমকালীন সাহিত্য সমালোচক ড. তাওফিক হাসান সোবহানির মতে, মাসনাভির পঙক্তি সংখ্যা ২৬,০৩২ টি। (সোবহানি, ১৩৭৫হি.শা: ২৫১)

ড. যবিহ উল্লাহ সাফার মতে এ গ্রন্থের পঙক্তি সংখ্যা ২৬,০০০ টি। কাশফুল যুনুনে বর্ণিত আছে, মাসনাভির চরণ সংখ্যা ৪৮,০০০ টি। ড. মোহাম্মদ এসতে'লামির মতে মাসনাভির ছয়টি খণ্ডে মোট ২৫,৬৮৫ টি বেইত আছে। (বালখি, ১৩৭৩হি.শা: মোকাদ্দেমে:৬৬) ক্যামিলি এ্যাডামস্ হেলমিনস্কির মতে বেইত সংখ্যা ২৫,৬৩২ টি। মাসনাভির বেইত সংখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও একটি বিষয় নিশ্চিত যে, এই কাব্যের পঙক্তি সংখ্যা ২৬,০০০- ৩২,০০০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

রুমি তাঁর মাসনাভিকে প্রদীপের আলোর সাথে তুলনা করেছেন। যার আলোয় মানবজগতের মনের কলুষতা দূরীভূত হয়ে যায়। রুমি যেমন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক, অগ্নি উপাসকের মধ্যে কোন ভেদাভেদ না করে ধর্মের টানে সবাইকে কাছে টেনে নিয়েছেন। ঠিক তেমনি তাঁর মোহনীয় মাসনাভির প্রেমময় সুর ধর্মের বেড়াজাল ভেদ করে সকল মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে। শুধু মুসলিম বিশ্বেই নয়, পাশ্চাত্যের দেশ গুলোতে মাসনাভির কদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। মাসনাভির একটি অন্যতম বিশেষত্ব হচ্ছে এটি কোন নির্দিষ্ট ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শাস্ত্র বা নীতিগ্রন্থ নয়। সকল ধর্মানুসারীগণের তত্ত্বপিপাসু যে কেউ এর গভীর ভাবার্থ ও অফুরান রসধারা উপভোগ করে পরিতৃপ্ত হতে পারে।

রুমির একটি সুন্দর উক্তির ইংরেজি অনুবাদ এরূপ-

“Come, come, whoever you are. Wanderer, worshipper, lover of leaving it doesn’t matter, Ours is not a caravan of despair. Come, even you have broken your vow a hundred times, Come, come again, come.”

এসো, এসো, তুমি যেই হওনা কেন, এসো! অগ্নি উপাসক বা পৌত্তলিক সেটা কোন বিষয় নয় যদি তুমি শতবারও তোমার ওয়াদা ভঙ্গ কর, তবুও তুমি এসো আমাদের কাছে। আমাদের কাছে আছে আশার আশ্বাস। তুমি যেমনটাই হও, এসো। এখানে তোমাকে জানানো হবে খোশ আমদেদ।”

ইংরেজি ভাষায় মাসনাভির অনুবাদক উইলসন বলেন, ‘‘মাসনাভি কেবল ধর্মতত্ত্বের ছাত্রদেরই নয়, বরং সাধারণ দর্শনের একটি বিশেষ গ্রন্থ হিসেবে সকল ছাত্রেরই পড়া উচিত’’।

এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এতে কোন সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ নেই। বিশ্বময় বিরাজিত প্রেমের মূল সংযোগ পেতে হলে আমাদেরকে পরম আরাধ্য আল্লাহর সাথে যুক্ত হতে হবে। (বাহাউদ্দিন, ২০০৯: ১০০-১০১)

মাসনাভির প্রতিটি বেইতে ঝংকৃত হয়েছে পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার মিলনের আকুল উম্মাদনা। সাহিত্য জগতে মাসনাভি নতুন না হলেও, রুমির মাসনাভির ভাবের গভীরতা ও প্রকাশভঙ্গি এই কাব্যগ্রন্থের পাতায় এক অপরূপ সৌন্দর্য লাভ করেছে।

সুফি কবি আব্দুর রহমান জামি রুমির মাসনাভির প্রশংসায় কাব্যিক চরণ দুটি রচনা করেছেন:

نیست پیغمبر ولی دارد کتاب
من چه گویم وصف آن عالی جناب

“মান চে গুইয়াম ওয়াসফে অন আলী জনাব
নিস্ত পেইগাম্বার ওলী দরাদ কিতাব”।

অর্থ: কী গুণগান করব আমি এই মহাত্মার?
যিনি পয়গম্বর নন, তবে একটি কিতাব আছে তাঁর।

রুমি মাসনাভির প্রতিটি খণ্ড শুরু করেছেন একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকার মাধ্যমে। প্রতিটি খণ্ডেই কাহিনী বর্ণনার পাশাপাশি শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিষয় বর্ণনা করেছেন। তবে গল্পের মাঝে শিক্ষামূলক বিষয়গুলো উল্লেখ

করতে গিয়ে অনেক সময় উক্ত কাহিনী থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছেন। তবে পুনরায় তিনি মূল কাহিনীতে ফিরেও এসেছেন। কোন গল্প বা কাহিনী বর্ণনার মাঝে অন্য কোন উপযুক্ত বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করলে, তাৎক্ষণিকভাবে সেই বিষয়ের অবতারণা করেছেন। রুমির উপদেশ, শিক্ষা ও নীতিকথা, সমস্ত কাহিনী শুধুমাত্র কুরআন ও হাদিসের বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছে। যা মানবজগতের জন্য নিয়ামতস্বরূপ।

মাসনাভি রচনার প্রেক্ষাপট

জালালুদ্দিন রুমির জীবনে শামস তাবরিযের আগমনের ফলে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই জ্ঞানতাপসের আবির্ভাবের পর থেকেই রুমি আধ্যাত্মিক কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। কেননা এই মহৎ মানুষটি রুমির মানসিকতায় ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন। রুমির বয়স যখন আনুমানিক ৩৭ বছর, তখন তিনি হযরত শামস তাবরিযের সান্নিধ্য লাভ করেন। এর দশ বছরেরও বেশি সময় পর থেকে রুমি একাধারে গযল, গীতিকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই রচনাবলি সংকলিত হয়েছে "দিওয়ানে কাবিরে"।

রুমির শেষ জীবনে (১২৬১-১২৭৩ খ্রি:) সকল ঝড় -ঝঞ্ঝা হতে মুক্ত হয়ে যখন শান্ত হৃদয়ে জীবন অতিবাহিত করছিলেন, তখন তাঁর অতিভক্ত এক সাহচর্য হুস্‌সামউদ্দিন চালাবি রুমির অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু হয়ে ওঠেন। চালাবির সাথে রুমির সখ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় একদিন হুস্‌সামউদ্দিন রুমিকে এক নতুন ধারার কাব্য রচনার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি রুমি কে পরামর্শ দেন যে, যদি সানায়ির *হাদিকাতুল হাক্বিকাত* ও *এলাহিনামে* এবং ফরিদুদ্দিন আত্তার রচিত *মানতেকুত তেইর* এর আদলে কোন বিশেষ কাব্য রচনা করেন, তবে তা সাহিত্য জগতে এক অমর কীর্তি গড়বে। আর এই গ্রন্থটিই পরবর্তীতে *মাসনাভিয়ে মা'নাভি* নামে পরিচিতি লাভ করে। সুফি কবি রুমি তাঁর সুফিদর্শন উপস্থাপনে আত্তারের *মানতেকুত তেইরের* কাহিনী ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার অনুসরণ করেছেন। রুমি আত্তার সম্পর্কে বলেছেন-

هفت شهر عشق را عطار گشت

ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

হাফত শাহ্‌র এশ্‌ক রা' আত্তার গাশত
মা' হানুয আনদার খাম ইয়েক কুচেয়িম।

ভাবানুবাদঃ

আত্তার প্রেমের সাতটি নগরী পরিভ্রমণ করেছেন

আর আমরা এখনও গলিপথের একটি বাঁকেই পড়ে রয়েছি।

হুস্‌সামউদ্দিনের প্রস্তাব শুনে রুমি মুচকি হেসে তাঁর পাগড়ির কুঁচির ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে আনলেন। যেখানে মাসনাভির প্রথম ১৮ লাইন লেখা ছিল। এই ঘটনায় চালাবি আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে রুমিকে বললেন, আপনি কিভাবে আমার মনের কথা জানলেন? রুমি আনন্দের সাথে জানালেন যে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমার অন্তরেও এ ধরণের কাব্যরচনার খেয়াল পূর্বেই উঁকি দিয়েছে; আর তার প্রয়োজনীয়তাও আমি অনুভব করেছি। তাই সেই চিন্তাধারা থেকে আমার কাব্যের প্রারম্ভিক ১৮ বেইত রচনা করেছি। আর এই ১৮ টি বেইত দিয়েই মাসনাভি লেখা শুরু হয়েছে, যা মাসনাভির ১ম খণ্ডের শুরুতে সংযোজিত হয়েছে। (বালখি, ১৩৭৩: ভূমিকা)

চালাবি রুমিকে মাসনাভির সংকলন আরো বাড়াতে অনুরোধ করলেন। রুমি তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে বললেন- "চালাবি, যদি তুমি লিখতে রাজি থাক, তবে আমি রচনা করব।"(ওয়াহেদ, ১৯২৪: ভূমিকা)

তাই রুমির বয়স যখন পঞ্চাশের কোঠায় তখন অর্থাৎ ১২৬১ খ্রিস্টাব্দের দিকে মাসনাভি রচনায় মনোনিবেশ করেন। রুমি নিজের আসনে বসতেন। আর মাসনাভির পঙক্তিগুলো সমুদ্রের ঊর্মিমালার ন্যায় প্রবাহিত হত। অনেক সময় তা এত দ্রুত আসত যে, তার সাথে তাল মিলিয়ে লিপিবদ্ধ করার কাজটি দুরূহ হয়ে পড়ত। লিপিবদ্ধ করা শেষ হলে চালাবি পুনরায় বেইতগুলো রুমির সামনে আবৃত্তি করে শোনাতেন; যেন কোন ত্রুটি না থাকে এবং ভুলভ্রান্তির সমাধান হয়ে যায়। মাসনাভি রচনা করতে করতে কোন কোন দিন পুরো রাত অতিবাহিত হয়ে যেত। এমনই এক রাতের আলোচনায় রুমি বলেন-

"হে ভোরের মালিক! ভোর হয়ে গেছে। তিনি তখন ফজরের নামায আদায় করতে যাচ্ছেন। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাসনাভি লেখা বন্ধ করতে হচ্ছে। আপনি আমার প্রিয় হুস্‌সামউদ্দিনের ওযর কবুল করুন।" (ওয়াহেদ, ১৯২৪: মাসনাভি রচনাংশ)

রুমি ও চালাবির মাঝে অসাধারণ মনের মিল ছিল। হুস্‌সামউদ্দিন রুমির সামনে আসলেই মাসনাভি যেন প্রবাহিত হতে শুরু করত। মাওলানা তাঁর গ্রন্থের অধিকাংশ স্থানে উল্লেখ করেছেন যে, মাসনাভি রচনার উৎসাহ তিনি হুস্‌সামউদ্দিনের কাছ থেকেই পেয়েছেন। মাসনাভির লিপিকার হুস্‌সামউদ্দিন বলেছেন যে, মাওলানা তাঁর কাব্য রচনার সময় কখনোই কলম হাতে নেন নি। তিনি যেখানেই থাকতেন, সেখানে বসেই মাসনাভির বেইতগুলো অনর্গল আবৃত্তি করে যেতেন। হোক সেটা মাদরাসায়, উষ্ণ কোন বসন্তে, কোনিয়ার কোন এক

হাম্মাম খানায় বা আঙুর বাগিচায়। মাসনাভি রচনা করতে করতে দিন গড়িয়ে রাত হয়ে যেত। রাতের পর রাত কেটে যেত। আবার কখনো কখনো কয়েক এমন মাসও অতিক্রান্ত হত, যখন মাসনাভি সংকলনের কাজ বন্ধ থাকত। আর একবার মাসনাভি রচনার কাজ একাধারে দুই বছর বন্ধ ছিল। (Helminski, 1994: 9-12)

এসময় হুস্‌সামউদ্দিনের স্ত্রী বিয়োগ ঘটে। তাই তিনি মানসিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। দুই বছর পর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আর পুনরায় মাসনাভির লিপিকারের দায়িত্বে অবতীর্ণ হন। রুমি তাঁর মাসনাভির দ্বিতীয় খণ্ড রচনার সময় একথা বলেছিলেন যে, হুস্‌সামউদ্দিনের অভাবে আমার কাব্য উদ্যানের পুষ্প-কলি সমূহ প্রস্ফুটিত হতে পারে নি। চতুর্থ খণ্ডের প্রারম্ভে রুমি হুস্‌সামউদ্দিনকে সম্বোধন করে বলেন-

"হে হুস্‌সামউদ্দিন! তুমি সৃষ্টিকর্তার সত্য জ্যোতি। তোমার আলোয় মাসনাভি চন্দ্রমণ্ডলকেও অতিক্রম করেছে। হে প্রিয়! তোমার অসম সাহসিকতা ও ধৈর্য্যের গুণে এই মাসনাভি কতদূর অগ্রসর হবে, তা সৃষ্টিকর্তাই ভাল জানেন। তুমি তোমার কাঁধে এর দায়িত্ব তুলে নিয়েছ, যেদিকে তুমি ভাল মনে কর, সেদিকে একে টেনে নিয়ে যাও।"

তিনি আরও বলেন, "হে আমার প্রাণের প্রাণ হুস্‌সামউদ্দিন! ষষ্ঠ খণ্ড বহু যত্নে প্রকাশিত হয়েছে। তোমার মত বিজ্ঞ ব্যক্তির উৎসাহে এই মাসনাভি তীক্ষ্ণ তরবারির ন্যায় গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।" (ওয়াহেদ, ১৯২৪: মাসনাভি রচনাংশ)

রুমি সবসময়ই হুস্‌সামউদ্দিনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। কেননা মাসনাভি রচনার পেছনে যিনি মূল উৎসাহদাতা ছিলেন, তিনি হলেন হযরত হুস্‌সামউদ্দিন চালাবি। আর রুমি তাকে স্বর্গীয় জ্যোতি বলে সম্বোধন করতেন। (ওয়াহেদ, ১৯২৪: ১৬-১৭) এভাবেই মাসনাভি রচনার কাজ চলতে থাকে। মাওলানা রুমির মৃত্যুর কিছু সময় পূর্ব পর্যন্ত মাসনাভি রচনা অব্যাহত ছিল। আর রুমিকে হুস্‌সামউদ্দিন চালাবি পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন। মাসনাভির ৬ষ্ঠ খণ্ডটির রচনা রুমির মৃত্যুর পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিল। তবে মাসনাভির সপ্তম খণ্ডের রচয়িতা সম্পর্কে কিছুটা ভিন্নমত পাওয়া যায় যে, এটি রুসুখি ইসমাঈল নামক এক ব্যক্তির কৃত্রিম সংযোজন। আবার অনেকে বলেন, এটি মাওলানা পুত্র কর্তৃক রচিত খণ্ড।(ওয়াহেদ, ১৯২৪: অভিমতপত্র)

কৌনিয়া শহরে ১২৬৯ খ্রিস্টাব্দে মাসনাভির একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। যা বর্তমানে মিসরের কায়রোতে সংরক্ষিত আছে। (বালখি, ১৩৭৩: মোকাদ্দেমে: ৯৩) এই পাণ্ডুলিপি থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ১২৬৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই রুমি মাসনাভির সংকলন সমাপ্ত করেছিলেন।

মাসনাভির উৎস

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির অমর কাব্যগ্রন্থ মাসনাভি শরিফের উৎস সম্পর্কে জানতে হলে সর্বাগ্রে তাঁর জীবনবোধ সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে। রুমি জীবনের পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতার আলোকে মাসনাভি কাব্য রচনা করেছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাথে পবিত্র কুরআন-হাদিসের অনিন্দ্য সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন এই কাব্যে। ধর্মীয় মতাদর্শের সাথে আধ্যাত্মিকতার সংযোগ স্থাপন করেছেন চমৎকারভাবে। যদিও এটি কোন ধর্মগ্রন্থ নয়, তবুও সাহিত্য জগতে এটি অত্যন্ত পবিত্র এক কাব্যগ্রন্থ। রুমি দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত ঘটনা বা বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁর মাসনাভিতে ঐ সমস্ত ঘটনাবলির প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে।

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি জীবনের শেষ বছরগুলোতে মহাগ্রন্থ মাসনাভি রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তাই বলা যায় যে, রুমি তাঁর জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে এ কাব্য সৃষ্টি করেছেন। রুমির অগাধ জ্ঞান কুরআন ও হাদিসের সাথে মিশ্রিত হয়ে মাসনাভি মহাকাব্যের সৃষ্টি করেছে।

মাসনাভিকে গল্প-কাহিনীর গ্রন্থ হিসেবে অনেকে অভিহিত করে থাকেন। মাসনাভির প্রায় ২৬,০০০ বেইতের মধ্যে ২৫,৬৪১ টি বেইতেই রয়েছে শরিয়তি, মারফতি, আধ্যাত্মিক ব্যাপারে নানা তত্ত্ব-উপাত্ত ও উপদেশমালা। মাসনাভির ছোট-বড় ৪২১টি গল্পে বিভিন্ন সংকেত ও নিগূঢ় ইশারার মাধ্যমে বিশেষ উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যা মানব সমাজকে সত্যিকার অর্থে অনেক উচ্চতায় নিয়ে যায়। রুমি তাঁর এ গ্রন্থে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা; যেমন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, মহাকর্ষণ, মহাশূন্য, গ্রহ-নক্ষত্র ও পারমানবিক অনু-পরমানুর বিশ্লেষণ বিষয়ক জ্ঞানের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। যা আজকের আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করে তোলে।

তিনি মাসনাভিতে বিষয়ভিত্তিক অর্থ্যাৎ কুরআন, হাদিস এবং নবিদের নানা রকম কাহিনী অবলম্বন করে নানা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সর্বপ্রথম উৎস হিসেবে রুমি পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনকে গ্রহণ করেছেন। এই ঐশী বাণীকেই মাসনাভি গ্রন্থ রচনার মূল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া নবি-রাসূলের জীবনী ও হাদিসের বিশ্লেষণ, পারিবারিক শিক্ষা, পিতা- পিতামহ এবং বংশপরম্পরায় যে জ্ঞান অর্জন করেছেন তার আলোকে মাসনাভি রচনা করেছেন। এছাড়াও সাধক পুরুষ শামস তাবরিযের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর সমস্ত জ্ঞান প্রজ্ঞায় রুপান্তরিত হয়। আর এসব কিছুরই প্রতিফলন ঘটেছে মাসনাভি রচনায়।

কোন নির্দিষ্ট একটি গ্রন্থ বা কোন বিশেষ ঘটনার আলোকে রুমি তাঁর মাসনাভি রচনা করেন নি। আর এ বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট কোন ইঙ্গিত বা মতামতও দেননি। রুমি মাসনাভিতে যে উপায়ে কাহিনী বর্ণনা, বাচনভঙ্গি, বক্তব্যের গুরুত্ব ও অর্থের অন্তর্নিহিত গাম্ভীর্য ও গভীরতা ফুটিয়ে তুলেছেন; তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর

কাব্যে হাকিম সানায়ি ও ফরিদুদ্দিন আত্তারের কাব্য প্রতিভার অনুসরণ করেছিলেন। আমরা যদি মাসনাভির কাহিনী অধ্যয়ন করি তাহলে দেখতে পাব যে, এই দু'টি গ্রন্থের সাথে মাসনাভির কাহিনীগুলোর মিল আছে। (বালখি, ১৩৭৩: মোকাদ্দেমে:৭৭) এছাড়াও আত্তারের *আসরার না'মে*, *মুসিবাত না'মে*, *তাজকিরাতুল আউলিয়া*, সানায়ির রচনাসমূহ, ইমাম গাযযালির রচনাবলি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তাই উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহকে মাসনাভির উৎস বলা যেতে পারে। মাওলানা রুমি তাঁর মাসনাভির কিস্‌সা ও কাহিনীর বিষয়াবলীর উৎস হিসেবে বেশকিছু গ্রন্থের সারমর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অর্থ্যাৎ এ গ্রন্থের কোন অংশের সাথে বিভিন্ন উৎস গ্রন্থের সরাসরি কোন সাদৃশ্য নেই। তবে এ সমস্ত উৎস গ্রন্থের নানাবিধ বর্ণনা মাসনাভিতে স্থান পেয়েছে। যেমন: মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবির *ফুতুহাতে মাক্কিয়াহ*, *ফুছুছুল হিকাম*, হাফেজ আবু নাঈম ইস্পাহানির *হুলিয়াতুল আউলিয়া*, আল্লামা যামাখ শারি রচিত *রবিউল আবরার*, এবং *কাছাছুল আম্বিয়া ও দালায়েলুন নবুয়াহ*। এ সমস্ত গ্রন্থের সাথে রুমির মাসনাভির কিছু কিছু কাহিনীর সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। (বালখি, ১৩৭৩: মোকাদ্দেমে: ৭৭)

মাসনাভির কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে এবং কিছু কিছু কাহিনীর বিষয়বস্তু *কালিলা ও দেমনা* থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রভাব রুমির মাসনাভিতে বিদ্যমান। কেননা *কালিলা ও দেমনা'*তে পশু-পাখির মাধ্যমে বিভিন্ন চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। ঠিক একইভাবে মাসনাভির বেশ কিছু কাহিনীতেও পশু-পাখির প্রতীকী রূপ ব্যবহৃত হয়েছে। (Abidi, 1974:8) মাসনাভিতে কিছু লৌকিক কাহিনীরও উপস্থিতি রয়েছে, যেগুলো সমাজে-লোকমুখে নানাভাবে প্রচলিত থাকায় রুমি এগুলোকে তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। তবে মাসনাভির বিষয়বস্তুর অধিকাংশই রুমির নিজস্ব মেধা ও মনন প্রসূত। কোন কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে যদি তিনি ভাবের অসম্পূর্ণতা অনুভব করতেন, তবে নিজস্ব ইচ্ছা ও চিন্তা শক্তি দ্বারা উক্ত কাহিনীকে পরিবর্তনের মাধ্যমে এক নতুন কাহিনীতে রূপান্তর করতেন।

মাসনাভির উৎস হিসেবে ধর্মীয় শিক্ষা, ফেকাহ বা ইসলামের আইন শাস্ত্র, এলমে তাসাউফ, ইতিহাস,আরবি-ফারসি সাহিত্যকে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাচীন যুগের কবি সাহিত্যিকগণ অর্থ্যাৎ যাঁরা রুমি পূর্ববর্তী বিখ্যাত কবি ছিলেন, তাঁদের কাব্যচিন্তার প্রভাব রুমির মাসনাভিতে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থে রুদাকি সামারকান্দির কবিতা, খাকানির কাসিদা, ফেরদৌসির *শাহনামা*, আনোয়ারির *দিওয়ান* গ্রন্থের প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়। (যাররিনকুব, ১৩৭২হি.শা: ২৪০)

মাসনাভির বিষয়বস্তু

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি তাঁর মাসনাভি কাব্যে মরমি শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। স্রষ্টার প্রতি মানুষের প্রেমানুভূতির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তবে কোথাও সরাসরি কোন তত্ত্ব উপস্থাপন করেননি। ধর্মীয় শিক্ষা ও

আধ্যাত্মিক ভাবধারার সংমিশ্রণ এই দ্বিপদী কাব্য মাসনাভি। রুমি মাসনাভি রচনায় মরমি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তাঁর পূর্ববর্তী কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে। তিনি বলেছেন-

عطار روح بود و سنایی دو چشم او

ما هنوز پی سنایی و عطار آمدیم

"আত্তার রূহ বুদ ও সানায়ি দু চেশমে উ
মা' আয পেইয়ে সানায়ি ওয়া আত্তার অমাদিম"

ভাবানুবাদঃ

আত্তার হলেন মরমি শিক্ষার প্রাণ আর সানায়ি তার দুই নয়ন
আমরা কেবল করছি তাদেরই অনুসরণ।

গ্রন্থটি নির্ধারিত কিছু বিষয়ের উপর রচিত নয়। এতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বহু প্রয়োজনীয় বিষয় স্থান পেয়েছে। মানুষের দ্বীন ও ঈমান অটুট রাখতে যে বিষয়গুলো প্রয়োজন, সেগুলোর সমন্বয় ঘটেছে রুমির কাব্যে। রুমি মূলত কুরআনের সারবস্তু তাঁর এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি তাঁর মাসনাভি সম্পর্কে বলেন-

من از قرآن مغزها برداشتم

استخوان را پیش سگان انداختم

"মান আয কুরআন মাগয্ হা' বারদা'শতাম

উস্তখা'ন রা পিশে সাগা'ন আনদা'খতাম"।

অর্থ: কুরআনের নির্যাস আছে যত আস্বাদন করি প্রাণভরে
অস্থিগুলো ফেলে দিলাম সারমেয় তরে।

মাসনাভির কাহিনীতে রয়েছে ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। কুরআনের বহু আয়াতের তাফসির রয়েছে এই গ্রন্থে। বিশেষ করে যে সমস্ত আয়াতে সাধারণের দৃষ্টি বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, ঐ শ্রেণির বিভিন্ন আয়াত সম্পর্কে রুমি অতি সরল ও সুন্দর উপমা

প্রয়োগের মাধ্যমে অনেক জটিল প্রশ্নেরও সরল সমাধান এনে দিয়েছেন। মাসনাভির ২৬,০০০ বেইতে রয়েছে অসংখ্য নীতিকথা সম্বলিত ছোট-বড় নানা গল্প-কাহিনী। কাহিনীগুলোতে কুরআন, বাইবেল এমনকি সংস্কৃত সাহিত্যেও *পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ* গ্রন্থের নীতিধর্মী কাহিনীর প্রভাব সুস্পষ্ট। এতে রয়েছে নবি কারিম (সা.) এর হাদিসের ব্যাখ্যা। এছাড়াও রয়েছে নবি-রাসূলগণের জীবনী ও তার আলোকে বর্ণিত নানা কাহিনী। আরও রয়েছে খোলাফায়ে রাশেদিনের বাণীর প্রতিফলন। বিশেষ করে হযরত আলি (রা.) এর অসংখ্য বাণীর উল্লেখ রয়েছে এই গ্রন্থে।

মাসনাভি কোন ধর্মীয়, ইতিহাস বা গল্পগ্রন্থ নয়। তবে একে সর্বাধিক অলঙ্কৃত করেছে এর গল্প ও উপকথাগুলোই। নানা রূপক ও উপমা ব্যবহার করে রুমি মূল্যবান আদর্শের শিক্ষা দিয়েছেন। শুধু আদর্শিক বিষয়াবলিই নয়, মরমি জগতের রহস্য, আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী প্রকাশ, নানা কিংবদন্তী কাহিনীর আদলে গুপ্ত মারেফাতের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।

মাওলানা রুমির মাসনাভি জ্ঞানের এক বিশাল মহাসাগর। এর সুবিশাল ভাণ্ডার থেকে যে কেউ নিজের জ্ঞানের পরিধি ও অনুভূতির প্রখরতাকে বাড়িয়ে নিজের অবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে লাভবান হতে পারে। (কাহদুয়ি, ১৯৯৬: ২৯)

রুমি তাঁর মাসনাভির বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি উক্তি করেছেন-

گر بریزی بحر را در کوزه ای

چند گنجد؟ قسمت یک روزه ای

"গার বেরিযি বাহ্‌র রা' দার কুযেয়ি

চান্দ গুনজাদ? কেসমাতে ইয়েক রুযেয়ি"।

(বালখি, ১৩৭৩: ১০)

কাব্যানুবাদঃ

সমুদ্রকে যদি ঢাল কলসিতে, কতটুকু পানি ধরবে তাতে?

যা কেবল একদিনের ই চাহিদা মেটাবে।

অনুরূপভাবে মাসনাভির বিষয়বস্তু সেই মহাসমুদ্রের ন্যায়। দু'চার পাতায় যা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সামান্য কিছু আলোচিত হলেও বাকি থেকে যায় অনেক কিছুই। আরবি জানা থাকলেই যেমন সমগ্র কুরআন বুঝা যায়

না। ঠিক তেমনি শুধু ফারসি জানলেই মাসনাভির প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা যায় না। এর মর্মার্থ বুঝতে হলে একটি মূল্যবান উপদেশ সর্বদা মনে রাখতে হবে:

گر سره معرفت آگاه شوی
لفظ بگذاری سوی معنا روی

"গার সের্‌রে মারেফাত আ'গা'হ শাভি
লাফ্‌য বেগোযারি সুইয়ে মা'না' রাভি"।

অর্থ: আধ্যাত্মিক জ্ঞানের রহস্য যদি জানতে চাও,
তবে শাব্দিক অর্থ ছেড়ে নিগূঢ় তত্ত্বের দিকে ধাবিত হও।

প্রখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন বলেছেন- When Love is in, reason is out. অর্থ্যাৎ প্রেম যখন হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন তা সমস্ত যুক্তি তর্কের ঊর্দ্ধে চলে যায়। প্রেম ও ভক্তির রাজ্যে যৌক্তিকতার কোন অবকাশ নেই। (বাহাউদ্দিন, ২০০৯: ১৮৪-১৮৫) ঠিক এভাবেই অধ্যাত্মবাদের গূঢ় রহস্য ভেদ করতে হলে যাবতীয় যুক্তি ও তর্কের সীমা অতিক্রম করে ভক্তি ও সাধনার আশ্রয় নিতে হবে। প্রেম ও অধ্যাত্মবাদ হচ্ছে মাসনাভির দর্শন।

মাওলানা রুমির মাসনাভি শরিফের প্রথম দফতরের ভূমিকা সম্পূর্ণ আরবিতে লেখা। এতে কুরআন শরিফের বিভিন্ন আয়াতের ভাবার্থ চয়ণে অসাধারণ ভাষাশৈলী ব্যবহৃত হয়েছে। (শাহেদী, ২০০৮: ২৬)

কুরআন ও হাদিসের অভ্যন্তরীণ অর্থের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, আল্লাহ পাকের মহব্বত হাসিল ও তাঁর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার পন্থা, তরিকত, মারেফাত ও হাকিকাতের গূঢ় রহস্যের বিস্তারিত বর্ণনা, চরিত্র সংশোধনের সহজ পথ, কিংবদন্তী কাহিনীর মাধ্যমে মূল্যবান উপদেশ প্রদান, নফ্‌স ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার উপায়সহ মাসনাভিতে আরও অসংখ্য বিষয় রয়েছে, যা সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা সম্ভব নয়।

মাসনাভির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর বরকত। পবিত্র কুরআন শরিফকে বলা হয় "বরকতময় কিতাব" ঠিক তেমনি মাসনাভিকেও বরকতময় গ্রন্থ হিসেবে অধ্যয়ন ও চর্চার মাধ্যমে অন্তরের রোগ দূর হয়। চিন্তা জগতের অমানিশা দূরীভূত হওয়ায় অন্তরের পবিত্রতা অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে জড়বাদ ও বস্তুবাদ মানুষের ধ্যান ধারণার জগতকে সংকুচিত করে তোলে। জড়বাদী লোকেরা বাহ্যিক পঞ্চেন্দ্রিয়ে বিশ্বাসী হয়। (ইসলাম, ২০১১:৫৯)

মাওলানা রুমি বাহ্যিক ইন্দ্রিয় অপেক্ষা আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়কে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা এগুলো সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত বিশেষ ইন্দ্রিয় যা বাহ্যিক ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শক্তিশালী, তীক্ষ্ণ ও মূল্যবান।

২য় পরিচ্ছেদ

মাসনাভির সামাজিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির মাসনাভি ফারসি সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক আধ্যাত্মিক কাব্যগ্রন্থ। রুমির ঐন্দ্রজালিক ভাষ্য এবং স্রষ্টার প্রতি নিখাদ প্রেমের আলোচনা প্রতিটি মানব হৃদয়ে এক স্বর্গীয় আবেশ সৃষ্টি করে। যে অনুভূতি মানুষকে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভবে সহায়তা করে। মাসনাভি কোন যৌগিক আলোচনার বিষয় নয়। এই মহাগ্রন্থ রচিত হওয়ার প্রায় সাড়ে সাতশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তবু আজও এর মূল আলোচ্য বিষয় পাঠক ও গবেষকগণের কাছে পরিপূর্ণ বোধগম্য হয়ে ওঠেনি। রুমির জীবনে তাঁর দীক্ষাগুরু শামস তাবরিযের আগমন ও বিচ্ছেদ- বিরহের ফলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অন্তরের গভীরে সাধিত হয় আমূল পরিবর্তন। পারিবারিক শিক্ষা, নৈতিকতা,ধ্যান-ধারণা, দেশ ভ্রমণ ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক বাস্তব ঘটনার আলোকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং দীক্ষাগুরুর প্রদর্শিত প্রেমের পথে হেঁটে রুমির মানবিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। তাঁর এই জ্ঞানভাণ্ডারের নির্যাস মাসনাভি কাব্যরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে। যার সুবাসে গোটা বিশ্বজগত মোহিত হয়েছে। মাসনাভির প্রথম ১৮ টি বেইতের পর্যালোচনা করলে খুঁজে পাওয়া যায় মানবিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া; যা মানবাত্মার হৃদয়ে পরমাত্মাকে অনুভব করার শক্তি জোগায়। মাসনাভির পঙক্তিগুলোর মাঝে রয়েছে মানবসমাজের জন্য নানা উপদেশ। আর এই নির্দেশনা মানুষকে মানবিক ও সামাজিক হয়ে উঠতে সাহায্য করে। বংশীনামায় বাঁশিকে রূপক হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। এই বাঁশি হল মানুষের রূহ বা আত্মা। রূহের বিরহ ফুটে উঠেছে বাঁশির করুণ সুরে। আত্মার জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বেদনা বাঁশির সুরে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আর এ করুণ সুর পুরো জগতের মানুষকে আবেগ তাড়িত করে তোলে।

রূহের জগত থেকে আত্মা যখন মানব শরীরে স্থিত হয়, তখন তা নানাভাবে কলুষিত হয়ে ওঠে। নফসকে দমন না করতে পারলে পার্থিব নানা কলুষতা সেই রূহের উপর ভর করে। তাকে স্রষ্টার সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। মানবাত্মা যখন মানবীয় সুকুমার বৃত্তিগুলোকে তার অন্তরে ধারণ ও লালনে সমর্থ হয়, পার্থিব কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা তখন তার কাছে ঘেষতেও পারেনা। মানবাত্মা তখন মহান আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করে এবং নফসের নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হয়। নফসকে দমন না করতে পারলে রূহ ধীরে ধীরে উচ্চ স্থান হতে নিম্নগামী হতে থাকে। ঠিক যেমনটি ঘটেছিল হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) এর সাথে। শয়তানের কুমন্ত্রনায় তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে ফেলে। আর তার শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে বেহেশত থেকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। অর্থ্যাৎ তাঁরা তাঁদের সৌভাগ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুর্ভাগ্যে পতিত হয়।

মাসনাভির কাহিনী ও উপমা অতি সূক্ষ্মভাবে মানুষের হৃদয়ে মানবিকতা ও আধ্যাত্মিকতার স্ফূরণ ঘটায়। যার প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী। যেমন একদিন মূসা (আ.) তুর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পথে তিনি এক রাখাল বালককে দেখতে পান। রাখাল বালকটি আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে তাঁর সাথে কথা বলছিল।

"সে বলছিল: হে মহান আল্লাহ! তুমি কোথায়? আমি তোমার চাকর হব, তোমার জামা সেলাই করে দেব। তোমার জন্য আমার মেষের দুধ এনে দেব। আরও অনেক কিছু।"

এ বক্তব্য শুনে মূসা (আ.) রেগে রাখাল বালকটিকে পাগল সম্বোধন করে বললেন- "আল্লাহর কি দেহ আছে? না হাত পা আছে? তিনি কি খাদ্য গ্রহণ করেন? নাকি তাঁকে দেখা যায়? তুমি পাগলের মত কথা বলছ কেন? একথা শুনে রাখালটি কষ্ট পেয়ে কেঁদে ফেলে আর বলে: হে মূসা! তুমি আমার মুখ বন্ধ করে দিলে, আমার হৃদয়কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলে। তারপর রাখাল বালক নিরাশ হয়ে চলে যায়।

ঠিক তখনি মূসা (আ.) এর নিকট আল্লাহর বাণী চলে আসে। বলা হয়, হে মূসা! তুমিতো এই দুনিয়ায় বান্দার সাথে আমার মিলন ঘটাতে এসেছ, বিচ্ছেদ নয়। তাহলে কেন তুমি তিক্ত কথা বলে আমার বান্দাকে আমার থেকে পৃথক করলে? একথা শুনে মূসা (আ.) লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। রুমি তাঁর মাসনাভিতে এই কাহিনীর অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন। (রুমি, ১৩৭৩হি.শাঃ ২৪৬-২৪৮)

এই কাহিনীর মর্মবাণী হল বান্দা তার স্রষ্টার সাথে যেকোন উপায়েই সংযোগ স্থাপন করতে পারে। সেটা শুধুমাত্র ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক পন্থায় হতে হবে, তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ব্যক্তি বিশেষে এর তারতম্য ঘটতে পারে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্কই মূখ্য বিষয়। মাধ্যম মূখ্য নয়। রুমির দ্বিপদী কাব্য মাসনাভি আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং নিগূঢ় রহস্য উদঘাটনের অন্তর্নিহিত মূলনীতি। ঐশীবাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মর্মবাণী হচ্ছে এই মাসনাভি। এ গ্রন্থ আধ্যাত্মিক পথিকগণের পথপ্রদর্শক, যা নফসের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্রষ্টায় বিলীন হওয়ার পথ দেখায়। ধৈর্যশীলদের করে তোলে আরও ধৈর্যশীল আর কাফেরের হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে অনুতাপ ও অনুশোচনা। মাসনাভির ভাবার্থ অন্তরে ধারণ করে কেউ কেউ হেদায়াতপ্রাপ্ত হন। আবার এর মর্ম অনুভব করতে না পেরে কেউবা পথভ্রষ্টই থেকে যায়। মাসনাভিতে মাওলানা রুমি খুবই সাবলীল ভঙ্গিমায় তাঁর অন্তরের কথা-ভাবাবেগ বর্ণনা করেছেন। এর প্রসিদ্ধি সারাবিশ্বে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। রুমি বুঝাতে চেয়েছেন যে, পার্থিব জগত মানব জাতির কাছে একটা আবদ্ধ খাঁচার ন্যায়। এই দুনিয়াবি মায়া ত্যাগ করে সঠিক পথের সন্ধান পেলে মানুষ তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবেই।

৩য় পরিচ্ছেদ

সাহিত্যের মানদণ্ডে মাসনাভির অবস্থান

সাহিত্যের মানদণ্ডে মাসনাভির মূল্য অপরিসীম। গোটা বিশ্বে মাসনাভির সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে। কেননা এর ভাষা অত্যন্ত মনোরম। মাসনাভির সুবিন্যস্ত বাচনভঙ্গি এবং সুনিপুণ কলা কৌশল এর গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। মাসনাভির সুর-ঝঙ্কার সারা পৃথিবীতে এক প্রেমময় আবহ গড়ে তুলেছে। তুরস্কের খ্যাতনামা গবেষক প্রফেসর ডক্টর এরকান তুর্কম্যান (Erkan Turkmen) রুমির জীবন ও মাসনাভি সম্পর্কে গভীর গবেষণালব্ধ এক দীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে গ্রন্থে তিনি রুমির মাসনাভির প্রথম ১৮ টি বেইতের বয়ান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার আলোচনায় পাওয়া গিয়েছে, মাসনাভির প্রথম বেইতের সূচনা হয়েছে আরবি হরফ "বে" দিয়ে এবং সমাপ্তি ঘটেছে "মিম" দিয়ে।

بشنو از نی چون حکایت می کند

پس سخن کوتاه باید وسلام

বেশনু আয নেই চুন হেকায়াত মি কোনাদ

পাস সোখান কুতা'হ বয়াদ ওয়াস্সালাম।

যার আদ্যাক্ষর "বে" এবং শেষ অক্ষর "মিম" । বেশনু'র বে এবং ওয়াস্সালাম এর মিম।

রুমি তাঁর কাব্য "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" দিয়ে আরম্ভ করেছেন। পূর্ববর্তী আরবি ও ফারসি লেখকগণ আল্লাহর প্রশংসা ও নবি প্রশস্তি দ্বারা তাঁদের লেখার সূচনা করতেন এবং রুমিও তার ব্যতিক্রম নন। (আব্বাসি, ২০১০: ৩০-৩১)

মাসনাভিতে ফিক্হ শাস্ত্র সংক্রান্ত শব্দাবলি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: "খুলা" ও "মুবারা"। এসব পারিভাষিক শব্দ সাধারণের পক্ষে বোঝা কঠিন। (বালখি, ১৩৭৩: ৩২৮) মাসনাভিতে নানা ধরনের আরবি ফারসি পরিভাষা ও তারকিব বা বিশ্লেষণ এর ব্যবহার রয়েছে। এছাড়াও এশিয়া মাইনর ও রোমের আঞ্চলিক চাহিদানুযায়ী কিছু গ্রিক শব্দও ব্যবহার করেছেন। যেমন ফারসি শব্দ আঙ্গুর ব্যবহার না করে তিনি এস্তাফিল শব্দের ব্যবহার করেছেন। রুমির ভাষায়-

آن یکی رومی بگفت این فیل را

ترک کن خواهیم استفیل را

"অন ইয়েকি রুমি বেগোফত ইন ফিল রা'

তারক কুন, খা'হিম এস্তাফিল রা' "।

যা মাসনাভির ২য় খণ্ড, বেইত নং ৩৬৮৬ তে পাওয়া যায়। এছাড়াও কিছু তুর্কি শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এশিয়া মাইনরে রুমির অবস্থান ও সেলজুকি দরবারের সাথে রুমির সম্পর্ক এবং খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে মাসনাভিতে এ সমস্ত শব্দ ভাণ্ডারের সন্নিবেশ ঘটেছে।

রুমি মাসনাভিতে অসংখ্য কাফিয়া ও রাদিফ ব্যবহার করেছেন। কাফিয়া বা ছন্দরীতির পারিভাষিক অর্থ হল, কোন একটি অক্ষর অথবা কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টিগত নাম। যেগুলো বিভিন্ন শব্দের মধ্যে বারবার ব্যবহৃত হয়। কাফিয়া সাধারণত কবিতার প্রথম দুই লাইনের শেষ শব্দে এবং বাকি লাইনগুলোর প্রতি দ্বিতীয় লাইনের শেষে ব্যবহৃত হয়। কবিতা কখনও কাফিয়া ব্যবহারের মাধ্যমেও সমাপ্ত হয়। অপরদিকে রাদিফ বলতে প্রতিটি চরণের পরিসমাপ্তিতে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি হওয়াকে বুঝায়। মাঝে মাঝে কাফিয়ার পরে রাদিফ ব্যবহারের মাধ্যমে কবিতার সমাপ্তি ঘটে। রুমি কোন কোন সময় একই শব্দকে একই ছন্দের মধ্যে বেশ কয়েকবার ব্যবহার করেছেন কিন্তু সেগুলোর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। রুমি বলেছেন-

صبح شد ای صبح را صبح و پناه

"সুবহ্ শোদ, এই সুবহ্ রা' সুবহ্ ওয়া পানাহ্"

অর্থঃ

হে ভোরের ও ক্ষমার মালিক, হে পরওয়ারদেগার, ভোর হল।

এই লাইনে প্রথম সুবহ্ দিয়ে সকাল বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় সুবহ্ দ্বারা সকালের স্রষ্টা আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে।

আরো একটি উদাহরণ হলো:

باز نور نور دل نور خداست

"বা'য নূর, নূরে দেল নূরে খোদাস্ত"

প্রথম নূর দ্বারা চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজির বাহ্যিক আলোকে বুঝানো হয়েছে, দ্বিতীয় নূর দ্বারা অন্তরের নূর কে বুঝানো হয়েছে। আর তৃতীয় নূর দিয়ে খোদার তাজাল্লিকে বুঝানো হয়েছে। (বালখি, ১৩৭৩হি.শা: মোকাদ্দেমে: ৭০)

রুমি মাসনাভি রচনার ক্ষেত্রে কবিতায় বাক্যের ওজন ঠিক রাখার জন্য কখনো কখনো শব্দকে ভেঙে ভেঙে ব্যবহার করেছেন। আবার কখনো বা ধ্বনির পরিবর্তন করেছেন। কবিতায় ব্যবহার করেছেন অসংখ্য উপমা। যা মাসনাভির সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। মাসনাভির সাহিত্যিক সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যে রুমি এতে আরবি-ফারসি শব্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। রুমির এ কাব্যের ভাষা মূলত খ্রিষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর খোরাসানি কাব্যশৈলীর ভাষাগত। (বালখি, ১৩৭৩: মোকাদ্দেমে: ৬৯) রুমি সাবকে ইরাকি তে মাসনাভি রচনা করেছেন। এই সংমিশ্রণের ফলে কবিতার ছন্দ বা ওজন মিলাতে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি। মাসনাভির কাব্যছন্দ হচ্ছে বাহ্‌রে রামাল মুসাদ্দেসে মাহ্‌যুফ ইয়া মাকসুর অর্থ্যাৎ ফায়েলাতুন ফায়েলাতুন ফায়েলুন।

بحر رمل مسدس محذوف یا مقصور: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

রুমি তাঁর মাসনাভিতে নিজস্ব বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এতে নানা গল্প ও কাহিনীর নান্দনিক বর্ণনা এর গ্রহণযোগ্যতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। মাসনাভির কাব্যানুবাদ পৃথিবীর বহু ভাষায় হয়েছে। এর গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা এত বেশি যে, পাঠক ও গবেষক শ্রেণি এর মূল তত্ত্ব আবিষ্কারে সদা তৎপর থাকে এবং মাসনাভিকে নিজেদের গবেষণার উপযুক্ত উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করে।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

মাসনাভির গ্রহণযোগ্যতা, গুরুত্ব ও প্রভাব

মাসনাভির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো মানুষ ও মনুষ্যত্ব। রুমির কাব্য রচনার মূল সুর হিসেবে বিধৃত হয়েছে আশাবাদ। মাসনাভির কোথাও কোন নিরাশা বা নিরুৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হয়না। তাঁর কাব্যের প্রতিটি চরণ যেন নতুন আশার বার্তাবাহক। এ গ্রন্থের অন্যতম একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, এতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং সংকীর্ণতার লেশমাত্র নেই। ধর্মীয় আচার, শাস্ত্রাদেশ বা ধর্মের বাহ্যিক আবরণ নিয়ে এতে কোন বাগাড়ম্বর নেই। মানবাত্মা ও পরমাত্মার অভ্যন্তরীণ শাশ্বত ঐক্য ও প্রেম এই কাব্যে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। রুমি সমগ্র বিশ্বকে একই স্রষ্টার সৃষ্টি বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। (বরকতুল্লাহ, ১৯৯৪: ৯৪,৯৬)

বিংশ শতাব্দির শেষাংশ ও একবিংশ শতাব্দির সূচনাংশে আজ অবধি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষেরা মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির আধ্যাত্মিকতায় গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। বিগত ৭৫০ বছরে মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে রুমি তাঁর অসাধারণ আধ্যাত্মিক কাব্য প্রতিভাবলে যে সুনাম অর্জন করেছেন, তার সুঘ্রাণ পাশ্চাত্য পর্যন্ত ছড়িয়েছে।

রুমির কাব্যের মূল প্রসঙ্গ হচ্ছে আধ্যাত্মিক প্রেম। নারী-পুরুষ বিশেষত তরুণ প্রজন্ম এই প্রেমদর্শনের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগী হয়ে উঠেছেন। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে যখন সমাজে ভোগবাদের বিষয়টি মূখ্য হয়ে উঠেছিল, ঠিক তখনি রুমির স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক ও তার অমীয় বাণী নতুন এক চমক নিয়ে এসেছিল। এরই প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যের তরুণ প্রজন্ম তাদের মনোজগতে বেশকিছু উপাদানের অনুপস্থিতি প্রকটভাবে অনুভব করে। যা তাদেরকে ভোগবাদ ও স্বার্থপরতার দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য করছিল। ঠিক সেই মূহূর্তে রুমির প্রেমময় বাণী তাদের অন্তরের অপূর্ণতাগুলোকে পূর্ণতায় ভরিয়ে দেয়। তাদের চিন্তা-চেতনার জগতে পরম স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস গভীরতর হয়। তারা নতুন করে আশার আলো দেখতে পায়। (Ali,2007:8-12)

রুমি মাসনাভিতে **১২৮১** ধরনের বিষয়ের অবতারণা করেছেন। মাসনাভিতে ৭৪৫ টি হাদিসের তাফসির ও ব্যাখ্যা রয়েছে। কুরআনের ৫২৮ টি আয়াতের উল্লেখ করেছেন তিনি। আর এসবের ব্যাখ্যা তিনি তাঁর গ্রন্থে যথার্থই প্রদান করেছেন। আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কুরআন পাকে খোদা তায়ালার মহিমা বর্ণিত হয়েছে। আর মাসনাভিতে সেই মহান সত্যের প্রতিফলন ঘটেছে। (কাযরুনি, ১৩৮৩হি.শা: ১১৭-১১৮)

মাওলানা রুমির প্রবর্তিত মাওলাভিয়া তরিকার সামা মজলিস অর্থ্যাৎ সঙ্গীতানুষ্ঠানে মাসনাভি পাঠ করা হত। এসময় পীর দরবেশগণ সাদা জুব্বা ও লম্বা টুপি পরিধান করে মাসনাভি পাঠের তালে তালে ঘূর্ণায়মান নৃত্য করতেন। মাসনাভি পাঠের আসর বসত। আর বর্তমান সময়েও এ প্রথা প্রচলিত আছে। বেশ আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে মাওলানার স্মৃতিচারণমূলক দিনগুলো পালিত হয়ে আসছে। এই সামা সঙ্গীত সিরিয়া, মিশর, ইরাক ও রোমের দ্বীপসমূহে প্রচলিত ছিল।

খাজু কেরমানি, হাফিজ সিরাজি, মোল্লা আব্দুর রহমান জামি মাসনাভির প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলমানদের পাশাপাশি উপমহাদেশের হিন্দুগণও মাসনাভি আবৃত্তি করতেন। পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে রুমির মাসনাভির অনুবাদ হয়েছে। আরবি, উর্দু, বাংলা, হিন্দি ও পাঞ্জাবি সহ ১২ টি ভাষায় মাসনাভির অনুবাদ হয়েছে। উপমহাদেশে কাওয়ালি পাঠের আসরে মাসনাভি বিশেষ সুর দিয়ে পাঠ করা হয়।

আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং খ্যাতিমান জার্মান রুমি গবেষক Annemarie schimmel এর ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ *দি ট্রাম্পফায়েল সান* বেশ জনপ্রিয়তা কুড়িয়েছে। ১৯৯২ সালে বোস্টনে প্রকাশিত তাঁর "I am wind, you are fire" গ্রন্থে বঙ্গদেশে রুমি চর্চা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "Short before 1500, even Hindu Brahmins in Bengal recited Mathnavi." (খান, ২০০৪: ৩)

বাংলাদেশের ব্রাহ্মণগণ পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বেও রুমির মাসনাভি পাঠ করতেন। (হক, ২০০৭: ৪২)

বিশ্ববিখ্যাত সংগীত শিল্পী ম্যাডোনা রুমির স্রষ্টা প্রেমের কবিতাকে গানে রূপ দিয়েছেন। এ্যালবাম "A Gift of Love" বের করেছেন। একজন আমেরিকান পপ তারকার কণ্ঠে মাসনাভির ইংরেজি অনুবাদ এটাই প্রমাণ করে যে, আজকের অত্যাধুনিক যুগের মানুষেরাও রুমির প্রেম ও আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ। বিশ্ববিখ্যাত ডিজাইনার ডোনা কারান তাঁর ফ্যাশন শো'র আবহ হিসেবে রুমি কাব্যের আবৃত্তি ব্যবহার করেছেন। (সাহিত্য সাময়িকী: ২০০২)

কোলম্যান বার্কস্ এর *The Soul of Rumi* গ্রন্থটি ৪০০ পৃষ্ঠার একটি কবিতা সংকলন। এছাড়াও তাঁর *The Essential Rumi* এবং *Rumi the Book of Love* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত *"The Essential Rumi"* বইটি আমেরিকার বেস্ট সেলার বিবেচিত হয়। যার আড়াই লাখ কপি ছাপা হয়েছিল। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে রুমির নামে অসংখ্য ফ্যান ক্লাব গঠিত হয়েছে। (সাহিত্য সাময়িকী: ২০০২)

চলচ্চিত্রকার অলিভার স্টোন রুমির জীবনী নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করতে আগ্রহ পোষণ করেছেন। Camille এবং Kabir helminski' র বিখ্যাত অনুবাদ *Rumi: Daylight A daybook of Spiritual Guidance* বিখ্যাত একটি বই। (দৈনিক প্রথম আলো, ২০০২)

মাওলানা রুমি ও তাঁর দর্শনতত্ত্ব নিয়ে কৃত গবেষণায় একজন প্রখ্যাত গবেষক "এন্ড্রু হার্ভে", যিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের "অল সোলস্ কলেজে"র একজন জনপ্রিয় ফেলো ছিলেন। সুফিতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহের ফলে তিনি ১৯৯৩ সালের এপ্রিল, মে ও জুন মাসে তাঁর দেওয়া বক্তৃতা মালার একটি সংকলন *রাগমার্গ* নামে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের ১ম পরিচ্ছেদ *ভালোবাসার দিকে যাত্রা* অংশে মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির জ্যোতির্ময় ও অতীন্দ্রিয়বাদী সুফি জীবনের নানাবিধ বিষয় নিয়ে অসাধারণ আলোচনা করেছেন। (আহমাদ,২০১৫:৩৯)

আমেরিকান দার্শনিক উইলিয়াম চিটিকের রুমি বিষয়ক গ্রন্থ: *দি সুফি ডক্টরিন অফ রুমি* (১৯৭৪) এবং *দি সুফি পাথ অব লাভ: দি স্পিরিচ্যুয়াল টিচিংস অব রুমি* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা প্রফেসর ফ্রাঙ্কলিন ডি লুইস এর *রুমি: পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট, ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট ২০০০* গ্রন্থের মাধ্যমে পাশ্চাত্যে রুমিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়াও রুমিচর্চায় আত্মনিয়োগ করে যাঁরা স্মরনীয়-বরণীয় হয়ে আছেন, তাঁরা হলেন: পাশ্চাত্যের স্যার উইলিয়াম জোন্স, ই.এইচ হুইনফিল্ড, এ. জে. আরবারি, ই.জি ব্রাউন প্রমুখ।

এডওয়ার্ড জি. ব্রাউন বলেন-

"Jalaluddin Muhammad, better known by his later litle of Mawlana (Our Master) Jalaluuddin Rumi is without doubt the most eminent sufi poet whom persia has produced, while his mystical Mathnavi deserves to rank amongst the great Poems of all time."(Brown, 1969 : 515)

প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক Joel waiz lal বলেন- By far the greatest and most uncompromising sufi writer of all ages is Jalaluddin Muhammad, commonly known as maulana Rumi. (Waizlal, 1925: 130-131)

The new Encyclopaedia Britannica বলা হয়েছে- "Jalaluuddin Rumi also called Mawlana. The greatest sufi mystic and poet in the persian language, famous for his lyrics and for his didactic epic masnavi ye-manavi (Spiritual Couplets) which is widely influenced muslim mystical thought and literature. (New Encyclopaedia,2002:475)

হেলমিনস্কি বলেছেন- We cannot still the fire we must enter it. (রশিদ,২০০৭:১০৮)

বাঙালি সাহিত্যিক ড. এনামুল হক বলেছেন-

"ফারসি সাহিত্যে মসনভি শ্রেণীর কবিতা ও কাব্যের অসদ্ভাব নেই। তথাপি শুধু "মসনভি" বললে অন্য কারও রচিত মসনভি না বুঝিয়ে জালালুদ্দিন রুমির বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ 'মসনভি' কেই বুঝিয়ে থাকে।" (ইউসুফ, ১৯৬৭: ৩)

জার্মানি লেখক যুফেহ্ বন হাম্মার বুরগেস্টল (Jopeh Von Hammer Burgestall) খ্রিষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মাসনাভির কিছু সংকলন জার্মান ভাষার পত্রিকা "প্রাচ্য পরিচয়" এ প্রকাশ করেছেন। (বালখি, ১৩৭৩: মোকাদ্দেমে: ৮৬)

বিখ্যাত রুমি গবেষক এবং অনুবাদক Reynold Allen Nicholson ১৮৯৮ সালে মাসনাভির ৬টি খণ্ড অনুবাদ করেন। অভিনেত্রী ডেমিমুর এবং গোল্ডি হাওয়ানের মত নামি-দামি হলিউড তারকারাও রুমি বন্দনায় নিবেদিত ছিলেন। মাসনাভির অনুবাদক Wilson এর মতে, রুমির মাসনাভি শুধু ধর্মতত্ত্ব অনুসন্ধানীদের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়, বরং সকল দর্শন অনুসারীদের কাছেই সমাদৃত। প্রখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬ খ্রি.), জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪ খ্রি.), মহাকবি গ্যাঁটে (১৭৪৯-১৮৩২ খ্রি.) রুমির মাসনাভির যথার্থতা স্বীকার করেছেন। (নূরী, ২০০০: ১২)

উপমহাদেশের দু'জন বিখ্যাত তারকা কবি ইকবাল লাহোরি ও মির্জা গালিব নিজেদের আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে রুমিকেই গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে, ২০০০ সালে ঢাকায় ইরানি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদীর পরিচালনায় মাসনাভি পাঠের সাপ্তাহিক আসর চালু ছিল। বর্তমানে তিনি অনলাইন ইউটিউব চ্যানেল ছায়াপথ প্রকাশনীর মাধ্যমে এই মাসনাভি পাঠের আসর পরিচালনা করে চলেছেন, যা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির ৮০০ তম জন্মদিবস উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আযারবাইজানের রাজধানী বাকু'র আততুর্ক স্টাডিজ কেন্দ্রে। সেই কেন্দ্রের প্রধান নিযাম জাভারেভ এ সম্মেলনকে আযারবাইজানের ইতিহাসে তুর্কি ভাষীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে উল্লেখ করেন। (নিউজলেটার, ২০০৭: ৫৫)

২০০৭ সালের ২৭ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাজধানী তেহরানে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় রুমির ৮০০ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক

রুমি সম্মেলন। এ সম্মেলনে ৭ টি সেশনে মোট ৪০ টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারগুলোতে Philosophy of Wisdom, Religion and Mysticism, Rumi in the Contemporary world, The art of story teller শীর্ষক বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সেশনের মাধ্যমে রুমি চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। (নিউজলেটার, ২০০৭: ৫৫)

ইউনেস্কো কর্তৃক ২০০৭ সালকে রুমি বর্ষ ঘোষণার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে আল্লামা রুমি সোসাইটি, বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইউনেস্কো, ঢাকা অফিস ও ঢাকাস্থ ইরানি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র যৌথভাবে ঢাকায় ২ দিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করে। ১ ডিসেম্বর ২০০৭ এ সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির মাসনাভির প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়া বাংলাদেশে সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্য ফারসির চর্চা ও বিকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ এবং আল্লামা রুমি সোসাইটি বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে প্রতিষ্ঠান দুটিকে ধন্যবাদ জানান। (আনিসুজ্জামান, ২০০৮ : ১৬৯-১৭২)

বাংলার মরমি কবি ও সাধক লালন শাহ (১৭৭২-১৮৯১ খ্রি.) এবং বিশ্বকবি ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) রচিত আধ্যাত্মিক কবিতাগুলোতে জালালুদ্দিন রুমির মাসনাভি শরিফের প্রভাব সুস্পষ্ট। রবি ঠাকুর *পারস্যের যাত্রী* গ্রন্থে ইরানিদের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, "এদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ।" রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পিতা এবং পিতামহ সবাই ফারসি সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের *দুই পাখি* কবিতাটি রুমির *পারান্দেগান* কবিতার আলোকে রচিত। গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ মাসনাভির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

কবিতার অংশবিশেষ তুলে ধরলাম:

এই করেছ ভালো নিঠুর
এই করেছ ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।

বাংলাদেশের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩ খ্রি.), ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৮২ খ্রি.), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪ খ্রি.), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.), ড. মুহাম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৯৯ খ্রি.) প্রমুখ ফারসি সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। জালালুদ্দিন রুমির *বংশি বিলাপ* আর বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলী *বংশি খণ্ড* একই ভাব, সুর ও ঢঙে রচিত।

বংশি বিলাপ (জালালুদ্দিন রুমি) থেকে-

"শুন লা সজনি! একি সে কাহিনী শুনায় বাঁশের বাঁশি,

ফরিয়াদ তার ফাটিয়া পড়িছে বিরহ বেদন বাঁশি।

অপরদিকে, *বংশি খণ্ড* (বড়ু চণ্ডীদাস) থেকে -

"আকুল শরীর মোর বেআকুল মন

বাঁশির শব্‌দে মোর আউলাইলো রান্দন।"

(বাহাউদ্দিন, ২০০৯: ৮৬)

চণ্ডীদাসের প্রসিদ্ধ চরণ-

"শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"।

নজরুলের ভাষায়-

"মিথ্যা শুনিনি ভাই, এ হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই।"

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায়-

"পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"

এসব বক্তব্য ও কবিতার চরণ রুমির মাসনাভির সরাসরি অনুবাদ অথবা তাঁর ভাবধারার অনুসারী। (বাহাউদ্দিন, ২০০৯: ৮৪)

রুমির মাসনাভি প্রেম ও অধ্যাত্মবাদের মহাসমুদ্র। গোটা বিশ্বে এর প্রভাব, সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা শীর্ষস্থানীয়।

তথ্যসূত্র

ফারসি গ্রন্থসমূহঃ

১. দরূদগারিয়ান, ফরহাদ (১৩৯২হি.শা)। *তাক্বাবেলে এশ্ক ও আক্ল দার মাসনাভি*, জয়তুন সব্জ প্রকাশনা, তেহরান;

২. শাহিদি, সাইয়্যেদ জাফর (১৩৮০হি.শা)। *হাদিস হা' দার মাসনাভি*, মাজাল্লেয়ে তেহরান, তেহরান;

৩. সোবহানি, তাওফিক (১৩৭৫হি.শা)। *তারিখে আদাবিয়্যাত*, এন্তেশারাতে দানেশগাহে পায়ামে নূর, তেহরান;

৪. বালখি, মাওলানা জালালুদ্দিন মোহাম্মদ (১৩৭৩হি.শা)। *মাসনাবিয়ে মাওলানা জালালুদ্দিন মোহাম্মদ বালখি*, তেহরান;

৫. প্রাগুক্ত, *মাসনাবিয়ে মাওলানা জালালুদ্দিন মোহাম্মদ বালখি*, পৃ. ভূমিকা;

৬. প্রাগুক্ত, *মসবনী শরীফ* ১*ম খণ্ড*, পৃ. (১৬-১৭);

৭. প্রাগুক্ত, *মাসনাবিয়ে মাওলানা জালালুদ্দিন মোহাম্মদ বালখি*, পৃ. মোকদ্দেমে : ৯৩;

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. মোকাদ্দেমে : ৭৭;

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. মোকাদ্দেমেঃ ৭৭;

১০. যাররিনকুব, আব্দুল হোসাইন (১৩৭২হি.শা)। *সের্‌রে নেই* ১*ম খণ্ড*, এনতেশারাতে এলমি, খিয়াবানে ইনকিলাব, ইরান;

১১. কাহদুয়ি, মুহাম্মদ কাজেম (১৯৯৬)। *মাওলানা রুমী (রহ:) এর মাসনবীর প্রতি এক নজর*, ১৬তম বর্ষ, নবম সংখ্যা, নিউজলেটার, ইরান, দুতাবাসের সাংস্কৃতিক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা;

১২. প্রাগুক্ত, *মাসনাবিয়ে মাওলানা জালালুদ্দিন মোহাম্মদ বালখি*, ১ম খণ্ড, বেঈত-২০;

১৩. প্রাগুক্ত, *মাসনাভিয়ে মাওলানা জালালুদ্দিন মোহাম্মদ বালখি*, পৃ. মোকাদ্দেমে :৬৯;

১৪. প্রাগুক্ত, *মাসনাভিয়ে মাওলানা জালালুদ্দিন মোহাম্মদ বালখি*, পৃ. ৩২৮, বেঈত. ৩৬৮৬;

১৫. প্রাগুক্ত, *মাসনাভিয়ে মাওলানা জালালুদ্দিন মোহাম্মদ বালখি*, পৃ. মোকাদ্দেমেঃ ৭০;

১৬. কাযরুনি, সাইয়্যেদ আহমাদ হোসাইনি (১৩৮৩হি.শা)। *এশ্ক দার মাসনাভিয়ে মা'নাভি হামারাহ ভা পায়ুহেশি দার শেরে ফারসি*, প্রকাশনা: জাওয়ার, তেহরান;

১৭. প্রাগুক্ত, *দিওয়ান-ই-শামস তাবরিজ*, পৃ. ৩৯;

১৮.প্রাগুক্ত, *মাসনাভিয়ে মাওলানা জালালুদ্দিন মোহাম্মাদ বালখি*, পৃ. মোকাদ্দেমে: ৮৬;

১৯.রুমি, মোহাম্মদ জালালুদ্দিন (১৩৭৩হি.শা)। *মাসনাভিয়ে মানাভি*, বেঈত: ১৭২১-১৭২৩,১৭৪৯,১৭৫১,১৭৫২;

২০.জাফরি, জালালুদ্দিন (১৯৪০)। *তারিখে মাসনাভিয়্যাতে উর্দু, শেরকাতে মুসান্নেফিন*, লাহোর, পাকিস্তান।

ইংরেজি গ্রন্থসমূহ:

১. Arif, Seema (2008). *Mathnavi Maulvi Ma'Anvi A Touch Stone For truth,* Three Day International History Conference for Celebrating the 800th Birth Anniversary of Rumi, University of Sargodha, Sargodha;

২. Erguvan, Suat (2008). *Embodying Rumi's Thoughts,* Three Day International History conference for celebrating the 800th Birth Anniversary of Rumi, University of Sargodha, Sargodha;

৩. Huq, Ziaul (1927). *The Elements of Persian Rhetoric and Prosody*, The Islamia Art Press, Calcutta;

৪. Helminski, Camille and kabir (Translator) (1994). *Rumi Daylight A Daybook of Spiritual Guidance*, Shambhala South Asia Editions;

৫. Dr. S.A.H. Abidi (1974). *Mawlana Jalal-ud-Rumi His Times and Relevance to Indian Thought*, Nam Avaran Quarterly, New Delhi, Iran House;

৬. Ali, Dr. M. Shamsher Contemporary Implications of Mawlana Rumi's Thoughts, Dce-2007, Newsletter;

৭. The New Encyclopaedia Britannica, Maero Paedia, Vol.6, Chicago, 15th edition, 2002;

৮. Brown, Edward, G (1969). A Literary History of Persia, Volume- 2, The University Press, Cambridge;

৯. Waizlal, Joel (1925). An Introductory History of Persian Literature, Atma Ram and Sons Educational Publishers, Lahore;

বাংলা গ্রন্থসমূহ:

১. আহ্মাদ, মোস্তাক (অনুবাদক)(২০১৫)। *দিওয়ান-ই- শামস্ তাবরিজ*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা;

২. ওয়াহেদ, আবদুল (১৯২৪)। *মস্নবী শরিফ (প্রথম খণ্ড)*, মিন্টো প্রেস, চট্টগ্রাম;

৩. হক, ছৈয়দ আহমদুল (২০১৩)। *বাংলার রুমি ছৈয়দ আহমদুল হক*, আল্লামা রুমি সোসাইটি, চট্টগ্রাম;

৪. মোন্‌য়েম, সৈয়দ আবদুল (১৯৯৭)। *মছনবী শরীফের কাব্যানুবাদ*, বিজ্ঞান বার্তা প্রকাশন, চট্টগ্রাম;

৫. খান, কে. এম. সাইফুল ইসলাম (২০০৬)। *বাংলা ভাষায় রুমী চর্চা ছৈয়দ আহমদুল হকের অবদান, ছৈয়দ আহমদুল হকের ৯০ তম শুভ জন্মদিন স্মারক ২০০৬*, আল্লামা রুমি সোসাইটি, আন্‌জুমানে ফার্সি বাংলাদেশ;

৬. আহমাদ, মোস্তাক (২০১৫)। *মাওলানা রুমির আত্মদর্শন*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা;

৭. তামিমদারি, আহমাদ (২০০৭)। তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনুবাদ), *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, আলহুদা, আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা;

৮. আবদুল ওয়াহেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. (১১-অভিমতপত্র);

৯. আবদুল ওয়াহেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. (মসনবী রচনাংশ);

১০. বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ (২০০৯)। *বাংলাদেশে মরমি সাহিত্য ও রুমি চর্চায় সৈয়দ আহমদুল হক*, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;

১১. প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশে মরমি সাহিত্য ও রুমি চর্চায় সৈয়দ আহমুদল হক*, পৃ. ১৮৪-১৮৫;

১২. শাহেদী, মুহাম্মদ ঈসা (২০০৮)। *মসনবী শরীফ*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা;

১৩. শাহেদী, মুহাম্মদ ঈসা (২০০৮)। *মসনবী শরীফ*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা;

১৪. শাহেদী, মুহাম্মদ ঈসা (২০০৮)। *মসনবী শরীফ*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা;

১৫. আব্বাসী, মুস্তাফা জামান (২০১০)। *রুমির অলৌকিক বাগান*, মুক্তদেশ প্রকাশন, ঢাকা;

১৬. বরকতুল্লাহ, মোহাম্মদ (১৯৯৪)। *পারস্য প্রতিভা*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা;

১৭. হক, ছৈয়দ আহমদুল (২০০৭)। *বাংলাদেশের সূফী সাহিত্য*, আল্লামা রুমি সোসাইটি, চট্টগ্রাম;

১৮. রশিদ, মোঃ মুমিত আল (২০০৭)। *মাওলানা জালালুদ্দিন রুমীর ৮শ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আন্তর্জাতিক রুমী সম্মেলন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;

১৯. নূরি, সানাউল্লাহ (২০০০)। *ইউরোপিয় সাহিত্যে প্রাচ্যের মহাকবি রুমীর জনপ্রিয়তা*, দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা, ঢাকা;

২০. প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশে মরমি সাহিত্য ও রুমি চর্চায় সৈয়দ আহমদুল হক*, পৃ. ৮৬;

২১. প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশে মরমি সাহিত্য ও রুমি চর্চায় সৈয়দ আহমদুল হক*, পৃ. ৮৪;

২২. আনিসুজ্জামান, ড. (২০০৮)। *আন্তর্জাতিক রুমি সম্মেলন' ০৭ স্মারক গ্রন্থ*, আল্লামা রুমি সোসাইটি, ঢাকা;

২৩.ইউসুফ, মনিরউদ্দিন (১৯৬৭)। *রুমীর মসনবী*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা;

২৪.খান, কে এম সাইফুল ইসলাম (২০০৪)। *বাংলা ভাষায় রূমী চর্চা: সৈয়দ আহমদুল হকের অবদান*, আল্লামা রুমি সোসাইটি, ঢাকা;

২৫.দৈনিক প্রথম আলো, ১৫/১২/২০০২ সালে প্রকাশিত সাহিত্য সাময়িকী;

২৬.*সাহিত্য সাময়িকী*, দৈনিক প্রথম আলো, ২০০২।

৫ম অধ্যায়

মাসনাভিতে চিত্রিত নারী চরিত্র

১ম পরিচ্ছেদ – যুগ পরিক্রমায় নারীর অবস্থান

২য় পরিচ্ছেদ – ফারসি সুফি কবিদের সাহিত্যে নারী

৩য় পরিচ্ছেদ – মাসনাভিতে নারীর অবস্থান ও চরিত্র বিশ্লেষণ

১ম পরিচ্ছেদ

যুগ পরিক্রমায় নারীর অবস্থান

মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই জীবন সংগ্রাম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নয়নে মানব সমাজের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সক্রিয় ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। সামাজিক উন্নয়ন সচল রাখতে প্রয়োজন নারী-পুরুষের সহাবস্থান ও নির্বিঘ্ন কর্মপ্রয়াস। উভয় পক্ষের যৌথ প্রচেষ্টায় নিশ্চিত হয় সমাজের সকল উন্নয়ন। আদর্শ সমাজ গঠনে নারী-পুরুষের সহাবস্থান নিশ্চিত করতে প্রয়োজন নারীর যোগ্য মর্যাদা। আর এ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। সমাজ যদি তার অর্ধাংশ অর্থ্যাৎ নারীকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়, তবে সমাজের উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। কবির ভাষায় -

''বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।''

(সঞ্চিতা, কাজী নজরুল ইসলাম)

প্রাগৈতিহাসিক যুগ উত্তরণের পর আনুমানিক নয় হাজার খ্রি.পূর্বাব্দে মেসোপটেমিয়া[১], লেবানন, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, পূর্ব তুরস্ক, ইরাক, গ্রিস, চিন ইত্যাদি অঞ্চলে মানবজাতি বসবাস শুরু করে আর তারই ধারাবাহিকতায় সমাজ ও সভ্যতার উন্মেষ ঘটে।

---

১. **মেসোপটেমিয়া:** প্রাচীনকালে মিশর হতে পারস্য উপসাগরের পূর্ব তীর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে মেসোপটেমিয়া বলা হতো। এটি গ্রিক শব্দ, যার অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান। নদী দুটির নাম ছিলো: টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস (দজলা-ফোরাত)।

সমাজ-সভ্যতা সৃষ্টির সাথে সাথে গড়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক নিয়ম-কানুন। আর এই বিধি বিধান মেনেই আবর্তিত হতে থাকে সমাজে বসবাসকারি জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা।

প্রতিটি মানব শিশু স্বাধীন সত্তা নিয়ে জন্ম নেয়। একই উৎস থেকে নারী পুরুষের সৃষ্টি। তবে প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে নারী-পুরুষের মাঝে রয়েছে লৈঙ্গিক ও চারিত্রিক ভিন্নতা। স্রষ্টা নারীকে সৃষ্টি করেছেন মমতাময়ী ও নমনীয় বৈশিষ্ট্যে। যা তাকে পুরুষ থেকে ভিন্নমাত্রা দান করেছে। এই ভিন্নতার কারণে সমাজে নারীরা দূর্বল ও অসহায় বলে বিবেচিত হয়। যুগ পরিক্রমায় নারীর এই কোমল ও নমনীয় স্বভাবের কারণে স্বার্থান্বেষী পুরুষ সমাজ নারীকে অবহেলা করে চলেছে। খর্ব করে চলেছে নারীর সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ। যুগ ও সভ্যতার পরিক্রমায় নারীর সামাজিক মর্যাদা কখনোই তেমন স্বীকৃতি পায়নি। সমাজের সর্বস্তরে নারী বিলাসিতার সামগ্রী ও পুরুষের দাসী হিসেবেই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। প্রাচীন প্রায় সব ধর্ম ও সমাজে নারীরা নির্দিষ্ট পুরুষ অভিভাবকের অধিনস্ত এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যহীন বলেই বিবেচিত হয়ে আসছে।

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ধর্মেই নারীকে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর অবস্থান উন্নত হলেও প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিতে নারীর অবস্থান তেমন মর্যাদা সম্পন্ন নয়। পৃথিবীতে প্রচলিত বেশকিছু ধর্মে নারী শক্তির অনন্য রূপ ফুটে উঠলেও, বাস্তবিক জীবনে তার বহিঃপ্রকাশ তেমনভাবে ঘটেনা। অর্থ্যাৎ ধর্মগ্রন্থের পাতায় রয়েছে নারীশক্তির উপাখ্যান আর তার উচ্চমার্গীয় অবস্থার বিবরণ, আর এই সমস্ত বিষয় শুধুমাত্র ধর্মীয় বিধানের মাঝেই সীমাবদ্ধ রয়ে গিয়েছে।

যেমন গ্রিক উপাস্যগণের মাঝে উল্লেখ রয়েছে নারী দেবতার স্বরূপ। 'নেমেসিস' (Nemesis) ছিলেন প্রতিহিংসার দেবী, মোইরা (Moira) ছিলেন ভাগ্যদেবী, বিজয়ের দেবী ছিলেন নাইক (Nike), ন্যায়বিচারের দেবী ছিলেন থেমিস (Themis)। ঠিক তেমনি সনাতন ধর্মেও রয়েছে বিভিন্ন দেবীর আরাধনার প্রচলন। যেমন: দেবী দুর্গা (জগৎ জননী, দশভূজা, অসুর বিনাশকারি), মা কালি (তাণ্ডবকারি), লক্ষ্মী (ধন-ভাণ্ডারের দেবী), সরস্বতী (বিদ্যার দেবী), মা চণ্ডি ইত্যাদি। সনাতন ধর্মমতে, এই দেবীগণ নারীর বিভিন্ন রূপ বা অবতার নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন পৃথিবীর মঙ্গলার্থে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা অনেক উন্নত। তবে প্রচলিত হিন্দু সমাজ ও গ্রিক সভ্যতায় নারীর সম্মান অধিকারের বিষয়টি অনেকটাই প্রশ্নবিদ্ধ। দেবীগণ নারী অবতারে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবিক জীবনে নারীরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। আরও অনেক প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্ম রয়েছে যেগুলো নানাভাবে নারীর অধিকার ও সম্মানকে অবদমিত রাখার অপপ্রয়াস চালিয়েছে যুগ যুগ ধরে।

সামাজিক জীব হিসেবে নারী-পুরুষের সমমর্যাদার বিষয়টি সমাজে কতটুকু প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, সে বিষয়টিও আজকের বর্তমান সময়ে সমানভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। নারীর মেধা ও ক্ষমতা নানা কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার জাঁতাকলে পিষ্ট হওয়ায় নারীর স্বাধীনতা ও অধিকার ভূ-লুণ্ঠিত হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত।

ইংরেজিতে woman, girl, lady, female, lass, wife ইত্যাদি শব্দ দ্বারা নারী জাতিকে বুঝানো হয়। বাংলায় নারী শব্দের সমার্থক হলো: মেয়ে, জেনানা, রমণী, কামিনী, বামা, আওরাত, অবলা ইত্যাদি। ফারসিতে বলে زن، خانم، بانو (জান, খানুম, বানু)। নারী শব্দটি এসেছে মূলত ল্যাটিন শব্দ থেকে। (bn.emsayazilim.com) নারী শব্দটি

সাধারণত যে কোনো মহিলা মানুষ বোঝাতে অর্থ্যাৎ বিশেষভাবে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা মানবকে বোঝায়, যা মূলত 'মেয়ে' শব্দটির পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। (bn.m.wikipedia.org)

নারীর সমার্থক শব্দের মধ্যে 'অবলা' শব্দটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যা নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্নকারি অর্থ দেয়। নারীর বলিষ্ঠ কণ্ঠে কথা বলতে না পারা বা ভাব প্রকাশে অপারগতা রয়েছে ভেবেই এই জাতীয় শব্দ দিয়ে নারী জাতিকে পরিচয় করানো হয়। প্রাচীনকালে মানব সভ্যতার সূচনাকালে নারী জাতির প্রতি যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা হতো, আজকের দিনে এই 'অবলা' শব্দটির বহুল ব্যবহার তারই প্রতিফলন।

গ্রিক সভ্যতা

প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার কথা যদি আলোচনা করা হয় তবে জানা যায় যে, তৎকালীন নারীদের অবস্থা উন্নয়নের তেমন কোনো সুযোগ ছিলনা। বরং কোনো নারী যদি শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিজের অবস্থার পরিবর্তন করতে চাইতেন, তাহলে তা তথাকথিত গ্রিক সমাজের আড্ডার টেবিলে নিছক হাস্যরসের রসদ ছাড়া আর কোনোভাবেই মূল্যায়িত হত না।

কোনো নারী যদি নিজস্ব প্রচেষ্টায় এগিয়ে যেত, তবুও তার কোনো মূল্যায়ন ছিলনা সেই সমাজে। গ্রিকরা নারীদের সম্পর্কে বলত: নারী জাতি সব অকল্যাণের মূল। (হেমা, ২০২০: ৩০) গ্রিক সভ্যতায় নারীর সামাজিক অবস্থানের চিত্র সক্রেটিস ও এন্ডারস্কির ভাষায় নিদারুণ সৌন্দর্যে ফুটে উঠেছে।

সক্রেটিস বলেন- 'নারী বিশ্ব জগতের বিশৃঙ্খল ও ভাঙনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায়। যা বাহ্যত দেখতে খুব সুন্দর; তবে তা যদি চড়ুই পাখি ভক্ষণ করে, তাদের মৃত্যু অনিবার্য'।

এন্ডারস্কির ধারণামতে, ' অগ্নিদগ্ধ রোগী ও সর্পদংশিত ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব। কিন্তু নারীর জাদু প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়'। (www.onnoekdiganta.com)

রোমান সভ্যতা

রোমান সভ্যতা বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার মধ্যে অন্যতম। এখানে নারীর সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত অধিকার স্বীকৃত ছিলনা। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল তারা। জন্মের পর কন্যা সন্তান হিসেবে পিতার অনুগত এবং বিবাহের পর স্বামীর অধিনস্ত হিসেবে জীবন অতিবাহিত করতেন নারীরা। এ সমাজে স্বামীরা কোনো অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তাদের স্ত্রীদের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারতেন। (www.onnoekdiganta.com)

চিনা সভ্যতা

পৃথিবীর প্রাচীনতম চিনা সভ্যতায় নারীর অবস্থান ছিলো অত্যন্ত নিকৃষ্ট। চিনের ধর্মগ্রন্থে নারীকে দুঃখের প্রস্রবণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা সব সৌভাগ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। (খালেক, ১৯৯৫: ৫) একটি চৈনিক প্রবাদে এসেছে- ' তোমরা স্ত্রীর কথা শোন, কিন্তু বিশ্বাস করো না'। (আস-সাবায়ী, ১৯৯৮: ১৩)

অতলান্ত মৎস্যের গতিবিধির ন্যায় অপ্রমেয় ও অবোধ্য নারী চরিত্র বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত। তার মধ্যে সত্য পাওয়া দুষ্কর। তার নিকট মিথ্যা সত্য সদৃশ এবং সত্য মিথ্যাসম। (দ্যা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, পৃষ্ঠা: ৭৩২)

আর্কাইক যুগ

প্রাচীন বেশকিছু সভ্যতায় নারীকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। যেমন প্রাচীন আর্কাইক যুগের নারীরা সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্ত হতেন। (bn.eferrit.com)

স্পার্টান সভ্যতা

প্রাচীন স্পার্টা নগরীর নারীরা উন্নত এক সভ্যতা গড়ার কারিগর হিসেবে বিশ্বে সুপরিচিত ছিলেন। সমাজ তাদেরকে বেশ উদারতার দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করেছে।

স্পার্টান নারীরা ছিলেন শিক্ষিত এবং ঐ সমাজে নারী-পুরুষ একসাথে লেখাপড়ার সুযোগ পেতেন। পড়ালেখার পাশাপাশি নারীরা সঙ্গীত, কাব্য, দর্শন চর্চার সুযোগ পেতেন। সভ্যতার চরম শিখরে পৌছে যাওয়া স্পার্টা নগরীর পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভূমিকাও কোনো অংশে কম ছিলনা। তৎকালিন সমাজে একটা বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, 'একজন বুদ্ধিমতি নারীর গর্ভে বুদ্ধিমান সন্তানেরা বেড়ে ওঠে'। ১৮ শতকে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এই বিশ্বাসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছিলেন-

`Give me an educated mother, I shall promise you the birth of a civilized and educated nation.'

'তোমরা আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি দিব'।

স্পার্টান নারীরা জমি- সম্পত্তির মালিকানা পেতেন। স্পার্টান পুরুষদের শক্তিশালী হওয়ার পেছনে নারীদের ভূমিকা সবচয়ে বেশি। একজন নারীকে সম্মানিত করার মাধ্যমেই কেবল একজন সামর্থ্যবান পুরুষ গড়ে উঠবে তার ঘরে।

স্পার্টান রানী জর্জো কে একবার এক এথোনিয়ান নারী প্রশ্ন করেছিলেন যে, ' কোন গুণে স্পার্টান নারীরা পুরুষদের শাসন করার যোগ্যতা রাখে? রানী জবাবে বলেছিলেন- ' স্পার্টান নারীরা সত্যিকার পুরুষদের জন্ম দেয়, তাই তাদের শাসন করার যোগ্যতাও নারীদের থাকে'। (roarmedia.com)

নারী সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে কিছু প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে:

রুশ প্রবাদে এসেছে 'দশটি নারীতে একটি আত্মা'।

ইতালিয় প্রবাদে রয়েছে - 'ঘোড়া ভালো হোক কি মন্দ, মারপিটের প্রয়োজন। ঠিক তেমনি নারী ভালো হোক কি মন্দ তারও মারপিটের প্রয়োজন'। (www.daily-bangladesh.com)

স্প্যানিশ প্রবাদ মতে, কুৎসিত রমণী থেকে দূরে থাকা উচিৎ এবং সুন্দর রমণীর উপর ভরসা করা উচিৎ নয়। (Gustavo le Bon, 2016: 378)

পারস্য সভ্যতা

প্রাচীন পারস্যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থা ছিল নিষ্পেষিত ও নির্যাতিত। তাদের অবস্থা কিছুটা গ্রিক নারীদের অনুরূপ ছিল। পারস্যের নারীরা সামাজিক নানা কুসংস্কার, ব্যভিচার, অনিয়ন্ত্রিত বিবাহ প্রথা, কঠোর শ্রেণিবৈষম্য, দাস-দাসী প্রথা, লিঙ্গ বৈষম্য ও অনাচারে জর্জরিত জীবন অতিবাহিত করতেন। পারস্যে নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল, তবে আধুনিক কালের মত নয়। তারা শুধুমাত্র গৃহস্থালি সম্বন্ধীয় জ্ঞানার্জন করতে পারতো; যা সংসার পরিচালনায় কাজে লাগতো।

তবে পারস্যের ইতিহাসে রাজপরিবারের অসংখ্য শিক্ষিত নারীর সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁরা নিজস্ব মেধা ও দক্ষতা দ্বারা দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সম্রাট প্রথম শাপুর, সম্রাট আরদাশি'র স্ত্রী 'মুরশাদ'। তাঁর পদবি ছিলো 'রানীদের রানী'। (Harmitage Museum, St. Petersberg Russia, Inv.GL. 987; cf. Gignoux and Gyselen, 1987: 882)

কিছু কিছু নারী স্ব-মহিমায় সমাজে সম্মান প্রাপ্ত হলেও পারস্যের আপামর নারীর জীবন কদর্যতায় কলুষিত ছিল। তৎকালিন সমাজে নারীরা যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা পায়নি।

আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ

আধুনিক পাশ্চাত্যে শিল্প বিপ্লবোত্তর কালে নারীর অর্থনেতিক অধিকার কিছুটা স্বীকৃত হলেও নারীর মান-মর্যাদা, ইজ্জত-আবরু যুপ-কাষ্ঠের বলি হয়েছে প্রতিনিয়তই। ইংরেজ সমাজে পুরুষ তার স্ত্রীকে প্রয়োজন বোধে বা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের নিকট বিক্রি করতে পারতো। আর এই বিক্রয়ের আইন ১৮০৫ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল। (ইয়াসমিন, ২০১১: ৭৮) তবে বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য সমাজের চিত্র অনেকটাই ভিন্ন। নারীরা তাদের ন্যায্য অধিকার পরিপূর্ণভাবে ভোগ করছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সামাজিকতার গভীর প্রভাব পড়েছে মিসরিয় নারী স্বাধীনতা আন্দোলনে। নারী স্বাধীনতার প্রসিদ্ধ মিসরিয় দলপতি কাসিম আমিনের বিখ্যাত দু'টি গ্রন্থ *তাহরীরুল মারয়া* (নারী স্বাধীনতা) যেটা ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হয় এবং *আলমার আতুল জাদীদা* (নতুন মহিলা) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে। পরবর্তীতে এই গ্রন্থটি *আলমার আতুল মুসলিমা* নামে প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থগুলোতে মূলত আলোচিত হয়েছে ইসলামি শরিয়াতে বর্ণিত রীতি-নীতি, আদেশ-নিষেধ যে পরিবর্তিত যুগ ও সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে যেন মূল ভিত্তিসমূহ বিকৃত বা প্রভাবান্বিত না হয়; সেই বিষয়সমূহ। নারীর পর্দা প্রথার শিথিলতা, সাধারণ জীবন

যাপনে অংশগ্রহণ করার অধিকার, তালাক, একের অধিক বিয়ে করার সুযোগ ইত্যাদি বিষয়ে লেখক কাসিম আমিন পর্যালোচনা করেছেন। (নদভী, ২০০৪: ১১৬-১১৭)

মুঘল আমল

আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ব্রাহ্মণ্য উপনিষদে পুরুষের বহুগামিতার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পুরুষ কর্তৃক নারীদের অবাধ সম্ভোগের বিষয়টি প্রচলিত ছিল। এ সমস্ত নারীদের বসবাসের বিশেষ স্থান ছিল। তন্মধ্যে 'হেরেম' অতি পরিচিত নাম। এখানে বহু রমনী অনেক সুযোগ-সুবিধার সাথে একত্রে বসবাস করতেন। ইতালির ভেনিস নগরীতে জন্মগ্রহণকারি একজন ভেনিশীয় পর্যটক 'নিকোলো মানুচি'র (১৬৩৯-১৭১৭খ্রি.) বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মুঘলদের জেনানা মহল অর্থ্যাৎ হেরেমে রমনীগণের জন্যে অবিশ্বাস্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হত, শুধুমাত্র তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে। (banglapedia)

আর রাজা-বাদশাহ-সম্রাটগণ তাদের ইচ্ছানুযায়ী পছন্দনীয় রমনীর সাথে মিলিত হতেন। নারী জাতি ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেই প্রাচীনকাল থেকেই। মুগল বাদশাহদের স্ত্রী, উপপত্নী, দাসী, ক্রীতদাসীগণ এই হেরেমে বসবাস করতেন নিজ নিজ অন্তঃপুরে। (কাদির, ২০০৭: ২৩-৪৬)

সমাজ ও সভ্যতার উন্মেষের পর থেকেই মানুষের মাঝে কিছু নৈতিক ভাবধারার সৃষ্টি হয়, যা তাকে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হতে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবেই সমাজে নানা ধর্মমতের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করে। ধীরে ধীরে মানুষ নির্দিষ্ট কিছু ধর্মের প্রতি অনুগত হয়ে পড়ে। প্রাচীন মতাদর্শের মধ্যে যরথুস্ট্রবাদ, মানি ধর্ম, মাযদাক ধর্ম, অগ্নি উপাসক, ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, ইসলাম ধর্মের প্রচলন শুরু হয়। কালের বিবর্তনে অনেক ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে গেলেও বর্তমান যুগে কিছু ধর্ম আপন মহিমায় টিকে আছে।

মানি ধর্ম

আনুমানিক খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে প্রাচীন পারস্যে 'মানি' নামক এক মনীষী সম্রাট শাপুরের আনুকূল্যে নিজেকে নবি পরিচয় দিয়ে নতুন এক মতাদর্শ প্রচার করতে শুরু করেন। তখন এতদঞ্চলে যরথুস্ট্র নামক এক ধর্মের প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে যরথুস্ট্রবাদের বিপরীতে নব্য মতাদর্শটি 'মানি ধর্ম' নামে পরিচিতি লাভ করে। (Boyce & Mary, 2001: 111) বৈরাগ্যবাদ ছিল এ ধর্মের মূলনীতি। সন্ন্যাসবাদের শিক্ষা দেওয়া হতো এ ধর্মে। মানি ধর্মে নারীদের যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হয়নি বরং হেয় প্রতিপন্ন করে

প্রতিনিয়তই তাদের অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। সাধারণ সমাজে এ ধর্মটি তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে না পারায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। (Idem, 1997: 285)

মাযদাক ধর্ম

আনুমানিক (৪৮৮-৫২৮ খ্রি.পূ:) 'মাযদাক' নামে নতুন এক মতাদর্শের উদ্ভব হয়। এই মতাদর্শের প্রবক্তা ছিলেন যরথুস্ট্র পুরোহিত বামদাদের পুত্র মাযদাক। তাঁর নামানুসারে নতুন এ ধর্মটির নামকরণ করা হয় 'মাযদাক ধর্ম'। (Ehsan, 1983: 995-997) এ ধর্মে নারীর মর্যাদা দেওয়া হয়নি। সম্রাট প্রথম খসরু যরথুস্ট্রবাদ প্রচার করতে গিয়ে অসংখ্য মাযদাকপন্থিদের হত্যা করেন। এ কারণেই এই ধর্মমতটি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে। বিশ্বে ইসলাম প্রচারের প্রথম দুই-তিন দশক পর্যন্ত এ ধর্মটি টিকে ছিল। (Ehsan, 1983: 999)

অগ্নি উপাসনা

অগ্নি উপাসকেরা আগুনকে তাদের প্রধান দেবতা বলে মনে করেন। অগ্নি উপাসনাকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে Pyrodulia, Pyrolatry, Pyrolatria ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইন্দো-ইউরোপিয় অঞ্চলে যেমন যরথুস্ট্রবাদ ও হিন্দু ধর্মে অগ্নি উপাসনার প্রচলন রয়েছে। কেননা তাদের বিশ্বাস মতে, আগুন প্রকৃতির অত্যন্ত পবিত্র একটি উপাদান, যার সাথে মানব জীবন সরাসরি সম্পৃক্ত। (en.m.wikipedia.org)

ইহুদি ধর্ম

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন একটি ধর্ম হলো ইহুদি ধর্ম। আল্লাহ তায়ালার হুকুম অমান্যকারি অভিশপ্ত জাতি হলো ইহুদি জাতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ও ব্রিটিশ মদদে ইহুদিরা ফিলিস্তিনে বসতি গড়ে তোলে। পরবর্তীতে ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতি স্থাপনের কথা বলা হয়। (তথ্যসূত্র: দৈনিক সংগ্রাম ১২ জুন,২০০২: লক্ষ্য বিশ্ব শাসন) এ ধর্মে নারীর ভূমিকা বিভিন্ন বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইহুদি শরীয়তে বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী নারীর প্রতি আচরণ পরিবর্তিত হয়। ইহুদি মৌখিক আইন, রীতি-নীতি, সাংস্কৃতিক বিষয় সম্বন্ধীয় গ্রন্থ তাওরাত বা তোরাহ এবং ইঞ্জিল। এতে বিধি-বিধান সম্বলিত থাকে। ইহুদি মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেই কেবল কোনো ব্যক্তি ইহুদি হিসেবে বিবেচিত হবে। আসমানি কিতাব তাওরাতে এসেছে- নারী পুরুষের আনুগত্য করবে। নারীরা সম্পদের মালিকানা প্রাপ্ত হবে না। তারা পৃথক উপাসনা গৃহে গমন করে প্রার্থনা করতে পারতো।

তাওরাতের বিধান অনুযায়ী পুরুষ বিবাহের পর তার স্ত্রীর সাথে ন্যায়বিচার করবে। ইবরাহিম নবির আ. স্ত্রী সাইয়েদা সারা, ইয়াকুব নবির আ. স্ত্রী রেফকা ও রাহিল, দাউদ নবির আ. স্ত্রী আবিজাইল, মুসা নবির বোন মারয়াম প্রমুখ ইহুদি ধর্মের অনুসারি ছিলেন। ইসলাম পরবর্তী যুগে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ইহুদি ধর্মে বিবাহ অত্যন্ত পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। এ ধর্মে স্বামীরা তাদের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে সাথে সাথে বাসস্থান থেকে বের করে দিতে পারে। ইহুদি ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে- স্বামী যদি তার স্ত্রীর মধ্যে কোনো অপবিত্রতা খুঁজে পায়, তাহলে স্বামী যেন তালাকনামা লিখে স্ত্রীর হাতে দেয় এবং তাকে যেন বাসা থেকে বের করে দেয়। অতঃপর স্ত্রী যখন বাসা থেকে বের হয়ে গেছে তখন সে অন্য পুরুষের স্ত্রী হতে পারবে। (ডিউটেরনমি, ২৪: ১-২) তাওরাতে রয়েছে- 'নারী মৃত্যুর চেয়েও বেশি তিক্ত'। (Gustavo le Bon, 2016: 373)

ইহুদিদের বিশ্বাস্য কিতাব '*আহাদ নামায়ে আতিক*' এ উল্লেখ রয়েছে- নারী সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো পুরুষকে স্বস্তি প্রদান করা। নারী পাপ প্রবণ। পূণ্য অর্জনকারি কাজ করার কোনো যোগ্যতা নারীর মধ্যে নেই বলে সে মান সম্মানের যোগ্য হতে পারেনা। ইহুদি ধর্মমতে, নারীর ওপর সৃষ্টিকর্তার চিরন্তন অভিশাপ রয়েছে। নারীর কারণে সবার ধ্বংস অনিবার্য। (www.onnoekdiganta.com)

এ ধর্মমতে, 'পুরুষ সৎকর্মশীল ও সৎ স্বভাব বিশিষ্ট, আর নারী ভণ্ড ও বদ স্বভাবের। পৃথিবীর প্রথম মানব, আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। কারণ তাঁর স্ত্রী হযরত হাওয়া (আ.) এর প্ররোচনায় নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন। সেজন্যেই নারীকে অভিশপ্ত বলা হয়েছে। (আফিফি, তা.বি : ১৩)

খ্রিস্ট ধর্ম

পৃথিবীর অন্যতম ধর্ম হচ্ছে খ্রিস্টধর্ম। এ ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম বাইবেল। খ্রিস্টসমাজে নারীকে আত্মাহীন প্রাণী ও সন্তান উৎপাদনের প্রাকৃতিক যন্ত্ররূপে আখ্যায়িত করেছে। (জাফর, ২০০১: ৭৩)

এ ধর্মে নারীরা চরম অবহেলিত ও নিগৃহীত ছিল। খ্রিস্টানরা নারীকে পাপের প্রতীক বলে বিশ্বাস করতো। হযরত হাওয়া আ. এর ভুলের কারণে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হন। আর এ জন্যেই সমগ্র নারী জাতির রক্তেই পাপের বীজ রয়েছে বলে তারা মনে করে। খ্রিস্টান পাদ্রিগণ নারীকে নরকের দ্বার হিসেবে আখ্যায়িত করেন। নারীকে সর্বাপেক্ষা জঘন্যরূপে চিত্রিত করণ এবং অতি নিকৃষ্ট বিশেষণে ভূষিত করতে তারা বিন্দু পরিমাণ কুণ্ঠাবোধ করতো না। তাদের ধারণামতে, নারীকে Woman (Woe to man) অর্থ্যাৎ মানব সমাজের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার একমাত্র কারণ হলো

নারী। (কাদের, ১৯৯০: ৩৫) তাদের ধারণা, হযরত ঈসা আ. কে শুলবরণ করতে হয়েছে নারীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য। ঈসা নবির আ. মাতা হযরত মরিয়ম কে নিয়ে ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে তেমন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়নি। অথচ ইসলাম ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনে মাতা মরিয়মকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সুরা নাযিল হয়েছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে।

খ্রিস্টান ইতিহাসবিদগণ অনেক নারীকে সাধুদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তন্মধ্যে যীশুর মা মেরি অর্থ্যাৎ ঈসা নবির মাতা হযরত মরিয়ম কে বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন বলে মনে করা হয়। পুরুষের ভূমিকা ছাড়া মাতা মরিয়মের গর্ভে ঈসা নবির জন্মের যে বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হয়, তা একমাত্র মহান আল্লাহর কুদরতেই সম্ভব। কিন্তু খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসীগণ নবির জন্মের ঘটনাকে অন্যভাবে বিশ্বাস করেন, যা ফলে তারা শিরক নামক নিকৃষ্ট অপরাধের ভাগিদার।

তারতুলিয়ান খ্রিস্টান ধর্মের প্রাথমিক যুগের একজন ধর্মগুরু ছিলেন। নারী সম্বন্ধীয় খ্রিস্টিয় চিন্তাধারা তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছেন- 'সে শয়তান আগমনের দ্বার স্বরূপ, নিষিদ্ধ বৃক্ষের আকর্ষণকারিণী, আল্লাহর আইন ভঙ্গকারিণী, আল্লাহ প্রেরিত প্রতিনিধির ধ্বংস কারিণী'। ক্রাইসোস্টাম নামে একজন বড় ধর্মগুরু রয়েছেন। তিনি বলেছেন- নারী একটি অনিবার্য পাপ। একটি জন্মগত কু-প্ররোচনা, একটি আনন্দদায়ক বিপদ, একটি পারিবারিক আশংকা, ধ্বংসাত্মক প্রেমদায়িনী, একটি সজ্জিত দুর্ঘটনা। (www.daily-bangladesh.com) নারী স্রষ্টার মান-সম্মানে বাধাদানকারি, মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা। (আব্দুল আ'লা, ১৯৮৭: ১০) সেন্ট টমাস ঘোষণা করেছেন, 'নারী ঘটনাক্রমে সৃষ্ট একটি জীব। এটা জেনেসিস প্রতীকী হয়েছে, সেখানে ইভকে এ্যাডামের (হযরত আদম ও হাওয়া আ.) বুকের বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে'। (সিমোন, ২০০১: ১৫) খ্রিস্টধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বাইবেল পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর মানুষকে তাঁর প্রতিকৃতিতে তৈরি করেছেন। যেখানে নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা রয়েছে। তিনি প্রথম দম্পতি হিসেবে ইভ ও এ্যাডামকে সমান অংশীদার হিসেবে সৃষ্টি করেছিলেন। তবে ইভ যেহেতু নিষিদ্ধ গাছের ফল প্রথম খেয়েছিল এবং এ্যাডামকে খেতে বলেছিল, সেই কারণে ইভ এর অপরাধ এ্যাডামের তুলনায় বেশি। সেজন্যেই তাঁর উপর স্বামীর কর্তৃত্ব বেশি। (আদিপুস্তক ৩:১৬)

নিউ টেস্টামেন্ট বা বাইবেলের ২২নং অনুচ্ছেদে এসেছে- হে স্ত্রীগণ, প্রভুর জন্য আপনারা স্বামীদের বশ্যতা স্বীকার করুন। ২৪নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- গীর্জা যেমন খ্রিস্টের অধীন, তেমনি নারীরা সব বিষয়ে তাদের স্বামীর অধীন। বাইবেলের কোথাও এমন বলা হয়নি যে, নারী ও পুরুষ সমমর্যাদা সম্পন্ন। তবে নারীরা পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, একথাও বলা হয়নি। বরং সেখানে উল্লেখ রয়েছে- এক

লিঙ্গ অন্য লিঙ্গের উপর কর্তৃত্ব করা পাপ। মোটকথা, প্রাচীন খ্রিস্ট সমাজে নারীর শিক্ষা ও অন্যান্য অধিকার স্বীকৃত ছিল না। তাকে দুর্বল এবং নিকৃষ্ট জীব হিসেবেই বিবেচনা করা হত।

বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধধর্ম বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মসমূহের মধ্যে অন্যতম। এ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ নারী জাতির জন্যে তেমন কিছুই করেননি। আর এই ধর্মে নারীরা ততটা অবহেলিত নয়। মহামঙ্গল সূত্রে গৌতম বুদ্ধ মায়ের সেবা ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণকে উত্তম ও মঙ্গল বলে আখ্যায়িত করেছেন। (দৌলাতানা, ১৯৯৭: ১০৮)

একটা ঘটনার মাধ্যমে জানা যায় যে, রাজমহিষী মল্লিকাদেবী কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ায় রাজা বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তখন গৌতম বুদ্ধ রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- 'কন্যা সন্তানের জন্মহেতু কারো দুঃখ করা উচিৎ নয়। সুশীলা ও ধর্মপ্রাণ কন্যা হলে সে পুত্র অপেক্ষা শ্রেয় হয়। (বড়ুয়া, ১৯৯৬: ২২)

হিন্দু ধর্ম

হিন্দু ধর্ম সাধারণত বৈদিক, আর্য ও সনাতন ধর্ম নামে পরিচিত। হিন্দু ধর্মে নারীর কোনো মর্যাদা দেওয়া হয়নি। প্রাচীন হিন্দু ভারতীয় শাস্ত্রে বলা হয়েছে– মৃত্যু, নরক, বিষ, সর্প, আগুন- এর কোনটিই নারী অপেক্ষা মারাত্মক নয়। ধর্মগ্রন্থ মহাভারতে বলা হয়েছে- 'নারী অশুভ, সকল অমঙ্গলের কারণ, কন্যা দুঃখের হেতু'। (মহাভারত, ১: ১৫৯: ১১) মহাগ্রন্থ বেদ এ উল্লেখ রয়েছে - 'যজ্ঞকালে কুকুর, শুদ্র ও নারীর দিকে তাকাবে না'। (বেদ, ৩:২:৪:৬)

হিন্দু ধর্মে নারীকে কোনো উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রদান করা হয়নি। স্বামী স্ত্রীকে সেবাদাসীরূপে ব্যবহার করতো। ভারতীয় সভ্যতায় নারীর অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। প্রাচীনকাল থেকে সনাতন হিন্দু ধর্মে বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাকের কোনো রেওয়াজ ছিলনা। বৈবাহিক সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের। তবে বর্তমান সময়ে এই ধর্মেও তালাকের প্রথা চালু হয়েছে। ১৯৫৫ সালে ভারতে আইন করে তালাক প্রথা চালু করা হয়। স্বামীর অন্যায়-অত্যাচার স্ত্রীকে অকাতরে সহ্য করতে হতো। তবে স্বামী চাইলে তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারতো। হিন্দুধর্মের দেবতা রাম তাঁর স্ত্রী সীতাকে মিথ্যা সন্দেহের বশে পরিত্যাগ করেছিলেন। এছাড়া স্বামীর মৃত্যুর পর একই চিতায় স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে সতী করা হত। কারণ মনে করা হত যে, একজন বিবাহিত নারী স্বামী ছাড়া বেঁচে থাকার অধিকার রাখে না। বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ নামক কুপ্রথার কারণে সতীদাহ নামক জঘন্য অপরাধটি তৎকালীন সমাজে

জেঁকে বসেছিল। এ কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথাগুলো নারী বিদ্বেষী ছিল। আধুনিক কালে এগুলোর আর কোনো বৈধতা নেই।

রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩খ্রি.) একজন সমাজ সংস্কারক হিসেবে বহুল পরিচিত নাম। তাঁর উদ্যেগে উনিশ শতকে ধর্ম ও সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। সমাজে নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদার জন্যে তিনি নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছেন। সতীদাহ প্রথা নিবারণ, স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলন, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ প্রথা রোধ করে তিনি নারী জাতির জন্যে এক নতুন জীবন এনে দিয়েছেন। (ইসলাম, ২০১৪: ২৩)

আরব সভ্যতা

এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত বৃহত্তম আরব উপদ্বীপ, যার তিনদিক পানি দ্বারা বেষ্টিত। আরব উপদ্বীপকে 'জাজিরাতুল আরব'ও বলা হয়। আরব মূলত সেমেটিক শব্দ, যার অর্থ পরিত্যক্ত মরুভূমি। যে সকল জাযাবর জাতি জীবিকার সন্ধানে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতো, তাদেরকে আরব বলা হতো। (হিট্টি, ২০০৩: ৬)

প্রাক-ইসলামি যুগে পৃথিবীর সুধিমহলে এ অঞ্চলকে আল-আইয়ামুল জাহিলিয়াহ বা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ' নামে আখ্যায়িত করা হত। আইয়াম অর্থ দিন, সময় এবং জাহিলিয়াহ অর্থ অজ্ঞতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, শিষ্ঠাচার বিরোধী কার্যকলাপ, জ্ঞান বিবর্জিত হওয়া ইত্যাদি। এদের কোনো ধর্মগ্রন্থ ছিল না এবং মানবিকতার দিক থেকে তাদের অবস্থান ছিল পশুত্বের সর্বনিম্ন স্তরে।

ইসলাম পূর্ব আরব সমাজে নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। মানবরূপে কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়াকে চরম অভিশাপ হিসেবে ধরা হত। পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বহির্ভূত, চূড়ান্ত অবমূল্যায়িত প্রাণী হিসেবে পরিগণিত হত তৎকালীন নারী সমাজ। একজন নারী যখন কন্যা সন্তান প্রসব করতেন, তখন সেই মা কে ভোগ করতে হত অসহনীয় লাঞ্চনা-ভর্ৎসনা। এমনকি সদ্য জন্ম নেওয়া কন্যা শিশুটিকে জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা করা হত। আব্বাসীয় যুগে সংকলিত প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ *দিওয়ানুল হামাসা'র* বর্ণনা থেকে প্রাচীন আরবের কন্যা শিশু হত্যার বর্বর প্রথা সম্পর্কে জানা যায়। প্রখ্যাত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক রুভেন লেভি বলেন-

'সমাধি হলো কন্যাদের সর্বাপেক্ষা উত্তম বর এবং কন্যাদের সমাধিস্থ করা একটি সম্মানজনক কাজ'। (রুবেন, ১৯৯৫: ৪৪)

যদিও তৎকালীন আরবের সর্বত্র এতটা প্রকটভাবে এই বর্বর প্রথাটি প্রচলিত ছিল না। আরব বাসীর কন্যা শিশু হত্যার পেছনে কিছু অযৌক্তিক কারণ ও কুসংস্কার দায়ী ছিল। কন্যা জন্ম নিলে পরিবারের আর্থিক অসঙ্গতি তৈরি হতে পারে বলে তারা মনে করত। যুদ্ধে পরাজিত হলে শত্রুপক্ষ ঐসকল পরাজিত গোত্রের নারীদের দাসী হিসেবে ব্যবহার করবে, যা অসীম লজ্জা ও অপমান বয়ে আনবে। সম্ভ্রান্ত পরিবারে কন্যা সন্তান জন্মলাভ করলে সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। এই ভ্রান্ত ধারণাগুলো সমাজের প্রতিটি পরতে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে, তারা কন্যা শিশু হত্যার মত এত জঘন্য অপরাধকে কোনো অন্যায় কাজ বলে মনেই করতো না। সেই যুগে আবু হামযা নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ায়, তিনি লজ্জায়-অপমানে আত্নগোপনের আশ্রয় নেন। এতে মনঃকষ্টে তার স্ত্রী একটি কবিতা আবৃত্তি করেন:

'আবু হামযার কী হলো! সে আমাদের নিকট না এসে প্রতিবেশির বাড়িতে রাত্রি কাটায়। আমি পুত্রসন্তান প্রসব না করার দরুনই সে আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহর কসম! পুত্রসন্তান জন্মদান আমার ক্ষমতাধীন নয়।

আমরা শষ্যক্ষেত্র তুল্য। স্বামীগণ আমাদের মাঝে যে বীজ বপন করেন, তাতে সে শস্যের চারাই জন্মে। ইসলাম পূর্ব আরব সমাজে অর্থ্যাৎ কুরআন নাযিল হওয়ার আগে পৃথিবীর প্রায় সব ধর্ম ও সভ্যতাই নারীকে যথার্থ মর্যাদা দিতে পারেনি। (Malik, 1983: 12-15)

এসব কিছুর পরেও সেই সময়ে কিছু নীতিবান-শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব ঘটায় এই জঘন্য প্রথাটিকে প্রতিহত করার প্রয়াস চলে। তন্মধ্যে জাহিলী যুগের প্রসিদ্ধ কবি ফারাযদাকের দাদা ছা'ছা'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যিনি জীবন্ত কবরস্থ হওয়ার হাত থেকে ৯৪ জন কন্যা শিশুকে রক্ষা করার পাশাপাশি নিজ কাঁধে তাদের দায়িত্বভার তুলে নিয়েছিলেন। (ইউসুফ, ১৯৯৫: ৪৫)

প্রাচীন আরব সভ্যতায় নারীদের কোনো মর্যাদা ছিল না। তারা পড়ালেখার সুযোগ পেত না, সম্পত্তিতে কোনো অংশীদারিত্ব ছিল না। পুরুষের অনিয়ন্ত্রিত বিবাহের রীতি, বিবাহ বিচ্ছেদে পুরুষের অবাধ স্বাধীনতা, কুসংস্কার, সামাজিক অনাচার ও ধর্মহীনতা নারীর অবস্থা শিশুকাল থেকেই শোচনীয় করে তুলেছিল।

ইসলাম ধর্ম

মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী আল-কুরআন এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল সা. এর হাদিস দ্বারা পরিচালিত একেশ্বরবাদি ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের নাম ইসলাম। ইব্রাহিমীয় ধর্মবিশ্বাসের মূল শিক্ষা হল, আল্লাহ ছাড়া কোনো স্রষ্টা নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ সা. হলেন আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবি ও রাসূল। মুহাম্মাদ সা. হলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন তথা গোটা বিশ্বজগতের পথ প্রদর্শক। খ্রিস্টীয় ৭ম

শতাব্দীতে রাসূল সা. এর মাধ্যমে মক্কার জাবালে নূর পর্বতের নিকটে অর্থ্যাৎ আরবে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ সা. এর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআন নাযিল হতে থাকে, যা আল্লাহর ওহি হিসেবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন।

বাংলা নারী শব্দটির আরবি রূপ হল ইমরাতুন যার বহুবচন হল নিসা। আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআনে 'আন-নিসা' শিরোনামে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করা হয়েছে। নারীর পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও অধিকার রক্ষার্থে ও তাদের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে এই সূরাটি নাযিল হয়েছে। ইসলাম নারীর সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে যাবতীয় অধিকার নিশ্চিত করে নারী জাতিকে একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে পৌছে দিয়েছে; যা ইসলাম পূর্ব সময়ে অন্যান্য ধর্মমত ও মতাদর্শের দৃষ্টিতে একেবারেই অস্বীকৃত ছিল। সৃষ্টিশীলতা ও মৌলিকত্বের বিচারে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো বিভেদ নেই। তাই ইসলাম স্রষ্টার সৃষ্ট এই দুই ভিন্ন লিঙ্গের মানুষের মাঝে কোনো বিষয়েই কোনো পার্থক্য করেনা। (ইয়াসমিন, ২০১১: ৭৫-৭৮)

মানুষ আল্লাহ তায়ালার অত্যন্ত ভালোবাসায় সৃষ্ট আশরাফুল মাখলুকাত। মানব সৃষ্টির পরিকল্পনাকালেই তিনি তাদের সর্বোচ্চ মর্যাদা দানের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। (খলিল ও রশীদ, ২০১৫: ৪৮)

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে ইসলামের মানবিক ও শান্তিপূর্ণ বার্তা নারীর সামাজিক অবস্থানকে এক নতুন পর্যায়ে নিয়ে যায়; যেখানে নারী জাতির কন্যা, স্ত্রী, মা রূপে সর্বোচ্চ মর্যাদা পাওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। জান্নাত থেকে

আদম ও হাওয়া (আ.) এর বিতাড়িত হওয়ার জন্যে হাওয়া (আ.) কে এককভাবে দায়ী করা হয়। ইসলাম সেই দায় থেকে সমগ্র নারী জাতিকে মুক্তি দিয়েছে। কেননা, শয়তানের প্ররোচনায় আদম ও হাওয়া (আ.) দু'জনেই আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিলেন। সেজন্যে দু'জনই সমান অপরাধি। আল-কুরআনে এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে-

وَقُلنا يَأدَمُ اُسكُن أنتَ وَزَوجُكَ اُلجَنَّةَ وَكُلاَ مِنهاَ رَغدًا حَيثُ شئتُمَا وَلاَ تَقرَبَا هَذِهِ اُلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ اُلظَّلِمِينَ

''হে আদম, তোমরা এখানে বসবাস কর এবং যা ইচ্ছে খাও। তবে ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তীও হবে না, অন্যথায় তোমরা জালিমদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে পড়বে''। (সুরা বাক্বারাহ, আয়াত: ৩৬)

আল্লাহর আদেশ মেনে চলা নারী-পুরুষ উভয়েরই দায়িত্ব এবং এর প্রতিফলও দু'জনই সমানভাবে ভোগ করবে। তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহ বলেন-

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُم وَاَنتُم لِبَاسٌ لَّهُنَّ .

'' তারা (নারীরা) হচ্ছে পুরুষদের পোষাক আর তোমরা পুরুষরা হচ্ছো নারীদের পোষাক''।

(সুরা বাক্বারাহ, আয়াত: ১৮৭)

ইসলাম পূর্ব আরব সমাজে কন্যা শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই জীবন্ত মাটিচাপা দিয়ে হত্যা করা হত। হযরত মুহাম্মাদ সা. এর বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এই বর্বরতার অবসান ঘটে। নবজাতক কন্যা হত্যার বিরুদ্ধে প্রিয় নবি সা. এর পদক্ষেপ নেওয়ার কারণে কন্যারা ফিরে পেয়েছিল মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার অধিকার। কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়ার পরে যারা তাদেরকে হত্যা করবে, আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করবেন এবং পরকালে কঠিন শাস্তি দেবেন। পবিত্র কুরআনে এই ভয়াবহ শাস্তির ঘোষণা হওয়ার পর থেকে কন্যা হত্যার জঘন্য প্রথা বিলোপ পেতে থাকে। (বাহাউদ্দিন, ২০১৯: ১৩৬-১৩৭)

পবিত্র কুরআনে এসেছে-

وَ اِذَ بُشِّرَ اَحَدُهُم بِالأُنثَى ظَلاَّ وَجهُهُ مُسوَدًا وَّهُوَا كَظِيمٌ .

''যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হতো, তখন তার চেহারা হয়ে যেতো কালো, আর সে হয়ে পড়তো ক্লিষ্ট মানসিকতা সম্পন্ন। (সুরা : আন-নাহল, আয়াত: ৫৮)

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন-

وَاِذَا المَوءُدَةُ سُءِلَت بِاَيِّ ذَنبٍ قُتِلَت .

''যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল''।

(সুরা: আত-তাকবির, আয়াত: ৮-৯)

এই প্রশ্নের জবাবে ঐ কন্যা সন্তান যখন পরিবারের এবং পিতার অন্যায়ের কথা প্রকাশ করবে, তখন আল্লাহর গজবের হাত থেকে তারা রেহাই পাবে না।

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সা. ঘোষণা করেন-

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো কন্যা সন্তানের জনক হবে, সে সোজা আল্লাহর জান্নাতে স্থান পাবে'। অতঃপর রাসূল সা. কে জিজ্ঞেস করা হয়, যদি পরপর দু'টি কন্যা হয়? তিনি বলেন- যদি কারো দু'টি কন্যা সন্তান হয় সেও জান্নাতে যাবে এবং যদি কারো পরপর তিনটি কন্যাসন্তান থাকে সেও জান্নাতবাসী হবে'। (তিরমিযি, হাদিস: ১৯১২) তিনি আরো বলেন- 'যদি কারো কোনো কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে আর সে যদি ঐ কন্যা সন্তানকে মামা-মমতায় বড় করে তোলে, আদব-শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, সৎ চরিত্রের তালিম দেয়, বালেগ হলে সৎ পাত্রস্থ করে, তবে ঐ কন্যার লালন-পালনকারি পিতা আর আমি পরকালে আল্লাহর জান্নাতে পাশাপাশি অবস্থান করবো'। (মুসলিম, হাদিস: ২৬৩১)

পিতাদের আদর্শ হিসেবে মহানবি সা. অসাধারণ নজির সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজেই চারজন কন্যার পিতা ছিলেন। (বাহাউদ্দিন, ২০১৪: ২৯) কন্যাগণ হলেন- হযরত ফাতেমা রা., হযরত যয়নব রা., হযরত রুকাইয়া রা., হযরত উম্মে কুলসুম রা.। রাসূল তাঁর প্রিয় কন্যা ফাতেমার মর্যাদায় বলেছেন- 'ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা, নয়নের মণি। যে ব্যক্তি ফাতেমাকে কষ্ট দিল সে যেন আমাকেই কষ্ট দিল আর যে ফাতেমাকে সন্তুষ্ট করল সে যেন আমাকেই সন্তুষ্ট করল'। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৮৬৯)

মহানবি সা. ছিলেন একজন উত্তম স্বামী এবং সকল স্বামীর আদর্শ। হিজরি ১০ম খ্রিস্টাব্দে বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি স্ত্রীদের অধিকারের বিষয়ে সতর্ক ও যত্নশীল থাকতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- 'তোমাদের কাছে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম আর আমি আমার সমস্ত স্ত্রীর কাছে উত্তম ব্যক্তি'। (তিরমিযি, হাদিস: ৩৮৯৫) তিনি আরও বলেছেন- 'আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় তিনটি জিনিস হলো নামাজ, সুগন্ধি ও স্ত্রী'। (নাসায়ি শরিফ, হাদিস: ৩৯৩৯)

নারীর জ্ঞানার্জন ও বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে ইসলামের ভূমিকা অপরিসীম। পবিত্র কুরআনে মানুষকে জ্ঞানার্জনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। পর্যাপ্ত জ্ঞান একজন মানুষকে সত্যিকার অর্থে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়নে জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। বিদ্যার্জন মানুষের মৌলিক অধিকার। ইসলাম নারীকে জ্ঞানার্জনের স্বাধীনতা দিয়েছে, যা নারীর সামাজিক মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন-

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة .

'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরয'।

(বায়হাকি: ১৬১৪)

ইসলাম মায়ের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছে যা অন্য কোনো ধর্মে নেই।

নবি সা. অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করেছেন-

الجنت تحت اقدام الأمهات .

‘মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত অবস্থিত’।

(নাসায়ি, হাদিস: ৩১০৬)

মায়ের যথাযথ সম্মান করলে, উপযুক্ত খেদমত করলে, সমস্ত হক আদায় করলে সন্তানের জন্য জান্নাত লাভ সহজতর হয়ে যায়। মায়ের সম্মানের জায়গা কতোটা উঁচুতে রয়েছে তা একটি গল্পের মাধ্যমে জানা যায়। এক ব্যক্তি একদিন নবি সা. এর কাছে এসে মায়ের অবস্থানের বিষয়ে জানতে চাইলেন। নবিজি সা. বললেন- মায়ের অবস্থান প্রথম। এরপর লোকটি বলল, এরপর কার মর্যাদা বেশি? নবিজি সা. জবাব দিলেন- মায়ের। লোকটি পুনরায় একই প্রশ্ন করলো। এবারও নবিজি সা. উত্তর দিলেন- মা। অতঃপর লোকটি আবারও জানতে চাইলো চতুর্থ স্থানে কে? মহানবি সা. উত্তর দিলেন- বাবা। (বুখারি ও মুসলিম) অর্থ্যাৎ একথা দিয়ে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাবার চেয়েও মায়ের সম্মান ও মর্যাদা অনেক বেশি। মায়ের হক আদায়ের ব্যাপারে সন্তানকে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে।

ইসলাম পৃথিবীর অন্য সকল ধর্মের চেয়ে নারীর মর্যাদা রক্ষায় সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে। জন্মলাভের পর থেকে শুরু করে সমাজে যথার্থ সুরক্ষা ও সম্মানের ব্যবস্থা করেছে। কুসংস্কারের ঊর্দ্ধে উঠে হারিয়ে যাওয়া নারীর মর্যাদাকে পুনরুজ্জীবন দান করেছে।

২য় পরিচ্ছেদ

ফারসি সুফি কবিদের সাহিত্যে নারী

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার উন্মেষ পরবর্তী সময়ে সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। মানুষ সামাজিক জীব। তাই সমাজবদ্ধ হয়েই তাকে সমাজে বসবাস করতে হয়। প্রাচীনকাল থেকেই প্রায় প্রতিটি সভ্যতায় নারীকে অবদমিত রাখার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে, যার ভয়াবহ পরিস্থিতির চিত্র আমরা প্রাচীন আরবে দেখতে পাই। যুগ পরিক্রমায় নারীর সামাজিক অবস্থান ও গুরুত্বের বিষয়টি বিভিন্ন উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আজকের পরিস্থিতিতে এসেছে। প্রাচীন আরবের পাশাপাশি পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে দিনাতিপাত করছিল।

প্রখ্যাত পণ্ডিত, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ফিলিপ. কে. হিট্টি বলেন, '' সমাজের প্রতিটি স্তরে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নৈরাজ্য বিরাজমান ছিল। যার ফলে একজন মহান ধর্মীয় ও জাতীয় নেতার আবির্ভাবের ক্ষেত্র ছিল প্রস্তুত; সেই সাথে মানুষও মানসিকভাবে তাঁকে গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত ছিল''। (হিট্টি, ২০০৩: ১০০) যিনি গোটা বিশ্বের শান্তির বার্তাবাহক, মানব সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শক, রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ সা. এর প্রচেষ্টায় জীবন্ত সমাধিস্থ হওয়া থেকে ভূয়সী মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে নারী সমাজ। তৎকালিন আরব সমাজ এমন এক পর্যায়ে পৌছেছিল যে তাদের মাঝে মানবিকতার লেশমাত্র ছিলনা; মনুষ্যত্ব বিবর্জিত সমাজে পরিণত হয়েছিল। মানবিকতা থেকে যোজন যোজন দূরে বিরাজমান এই সমাজের মানুষগুলোকে সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছেন রাসুল সা.। দুনিয়াবাসীর সামনে ইসলাম ঘোষণা করেছে যে, নারীরাও পুরুষের মত একজন পরিপূর্ণ-পূর্ণাঙ্গ মানব সত্ত্বা, বরং তাদের মাঝে রয়েছে দয়া ও ভালোবাসা মিশ্রিত অপূর্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যা স্রষ্টা প্রদত্ত এক অনবদ্য গুণ। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে এসেছে যে লিঙ্গ বিভাজনের দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থ্যাৎ নারী-পুরুষ ভেদে মানুষের মাঝে কোনো তফাৎ নেই। মুহাম্মদ সা. এর বার্তা সেসময়ে নারীর রক্ষক হিসেবে ভূমিকা রেখেছিল। (Ghazali, 1376: 221)

প্রাচীন আরব সমাজের কিছু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য ছিল। সেই যুগে শিল্প-সাহিত্যের কদর ছিল ভিন্নমাত্রার। মক্কার নিকটবর্তী স্থান আরাফাত ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে 'ওকায' নামক এক বার্ষিক মেলার আয়োজন করা হত। উক্ত মেলায় বিভিন্ন ব্যবসায়ী শ্রেণি, নানা বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় প্রথিতযশা কবিগণ অংশগ্রহণ করতেন। এই মেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল কবিতার প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় সাতটি শ্রেষ্ঠ কবিতা নির্বাচন করা হত। নির্বাচিত সপ্ত কাব্য 'সাবায়ে মুয়াল্লাকাহ' নামে পরিচিত ছিল, যেগুলোকে পবিত্র কাবা শরিফের গাত্রে ঝুলিয়ে রাখা হত। আর এই সপ্ত কাব্য প্রাচীন আরবি সাহিত্যের কালোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে পৃথিবীর সুধিমহলে আজও সমাদৃত। (মুসলেহউদ্দীন, ১৯৮৬: ১০) আরবের মাটিতে যে শিল্প ও সাহিত্যের চর্চা হত তা গোটা বিশ্ববাসীর কাছে অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচ্য। এত কিছুর পরেও মানবিক মূল্যবোধ বিবর্জিত আচরণ এবং নারীর প্রতি চরম অবহেলার কারণে তৎকালিন প্রাক-ইসলামি আরবকে আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

আরবে ইসলামের আবির্ভাব হওয়ার পর থেকে সময়ের সাথে সাথে তা পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলাম এনে দিয়েছে শান্তির বার্তা। ইসলামি চিন্তা-চেতনার হাত ধরে পৃথিবীতে এসেছে আধ্যাত্মিকতা। যে আধ্যাত্মিকতা মানব মনে জাগিয়ে তোলে স্রষ্টার এক ভিন্ন রূপ। যুগে যুগে সাহিত্যের চর্চা যেমন বিকশিত হয়েছে, তেমনি বিস্তৃত হয়েছে

আধ্যাত্মিকতার মোহনীয় শোভা। সাহিত্যের আদলে আধ্যাত্মিকতার পরশ পাঠক হৃদয়ে এনে দিয়েছে পরম শান্তির ছোঁয়া। ইসলাম আবির্ভাবের পর থেকেই বিশ্বের খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্য রচনায় নানাভাবে নানা রঙে ফুটিয়ে তুলেছেন মরমি চেতনা-আধ্যাত্মিক ভাবনা। পৃথিবীর মানুষের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব হচ্ছে আল্লাহ প্রেরিত ঐশীবাণী পবিত্র আল-কুরআন।

আরবি সাহিত্য জগতে কবি-সাহিত্যিক হিসেবে যাঁদের নাম অমর হয়ে আছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমরুল কায়েস (৫০১-৫৪৪ খ্রি.), আল-মুতানাব্বি (৯১৫-৯৬৫খ্রি.), ইবনুল আরাবি (১১৬৫-১২৪০খ্রি.), ইবনুল ফরিদ (১১৮১-১২৩৫খ্রি.), হাফেয ইব্রাহিম (১৮৭২-১৯৩২খ্রি.) প্রমুখ।

ফারসি সাহিত্য জগতের খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকগণের মধ্যে রয়েছেন আবুল মুগিস আল হুসাইন বিন মানসুর হাল্লাজ (২৪৪-৩০৯হি.), আবুল কাসেম ফেরদৌসি তুসি (৯৪০-১০২০খ্রি.), আবু সাইদ আবুল খায়ের (৯৬৭-১০৪৯খ্রি.), ফখরুদ্দিন আস'আদ গোরগানি (- ১০৫৮ খ্রি.), ওমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩১খ্রি.), নিযামি আরুযি সামারকান্দি (১১১০-১১৬১খ্রি.), নিযামি গাঞ্জুভি (১১৪১-১২০৯খ্রি.), ফরিদ উদ্দিন আত্তার (১১৪৬-১২২১খ্রি.), শেখ সাদি (১১৮৪-১২৫৬খ্রি.), মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩খ্রি.), হাফেয সিরাজি (১৩১৫-১৩৯০খ্রি.), আব্দুর রহমান জামি (১৪১৪-১৪৯২ খ্রি.), মোহাম্মদ হোসাইন শাহরিয়ার (১৯০৬-১৯৮৮খ্রি.), সোহরাব সেপেহরি (১৯২৮-১৯৮০খ্রি.) প্রমুখ।

ফারসি কবিদের মধ্যে আবু সাইদ আবুল খায়েরের হাত ধরেই মূলত আধ্যাত্মিক সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল। সুফি ঘরানার সাহিত্য রচনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। খ্যাতিসম্পন্ন ফারসি কবিগণ তাঁদের কাব্যে নারী চরিত্রের অবতারণা করেছেন। কবিতার ছন্দে ছন্দে ফুটে উঠেছে নারীর নানাবিধ বৈশিষ্ট্য। নারীকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন এমন কয়েকজন কবি ও তাঁদের কবিতায় নারীর স্বরূপ তুলে ধরা হলো:

আবুল কাসেম ফেরদৌসি তুসি

আবুল কাসেম ফেরদৌসি একজন প্রতিভাবান কবি, যিনি ফেরদৌসি নামেই অধিক পরিচিত। পৃথিবীর দীর্ঘতম মহাকাব্য *শাহনামা'র* (Book of Kings) একক রচয়িতা তিনি। কবির জীবন বিচিত্র কল্পকথায় ঘেরা; আর তাই তাঁর মহাকাব্যের পরতে পরতে রয়েছে মনোমুগ্ধকর ও বিস্ময় জাগানিয়া সব কাহিনী। রয়েছে রূপকথার আবেশ, আর আছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির সমাবেশ। (কাফাফি, ১৩৮২হি.শা: ২৪৪-২৪৫) সামানীয় শাসনামলে ৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ইরানের তুস নগরীতে জন্ম নেন এবং গাযনাভি শাসনামলে ১০২০ খ্রিস্টাব্দে তুস নগরীতেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রচিত *শাহনামা* অতিদীর্ঘ এক কাব্যসংকলন, যা ইরানের জাতীয় মহাকাব্য নামে খ্যাত। মহাকাব্যটি (৯৭৭-১০১০ খ্রি.) এর মধ্যবর্তী সময়ে বহুল ব্যবহৃত ছন্দরীতি বাহরে মোতাকারেবে মাহযুফ ছন্দে রচিত। ইংরেজি, বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ হয়েছে। শাহনামায় গ্রন্থটি হোমারের ইলিয়াডের তুলনায় প্রায় তিনগুণ। নিযামি আরুযি সামারকান্দির মতানুসারে, সুলতান মাহমুদ গাযনাভির দরবারে মোট সাত খণ্ডে শাহনামা উপস্থাপিত হয়েছিল। এ রচনায় স্থান পেয়েছে প্রাচীন ইরানের ইতিহাস এবং পৌরানিক কাহিনীসমূহ। কাহিনীগুলোর মাঝে রয়েছে বেশকিছু নারী চরিত্র, যা থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হলো:

তুরান দোখত্ঃ

তুরান দোখত্ ছিলেন বাদশাহ খোসরু পারভেযের কন্যা। দোখতারে তুরান অর্থ্যাৎ তুরান দেশের কন্যা। ১৭৩৫ খ্রি.পূর্বাব্দের দিকে প্রাচীন পারস্যে 'টায়রা' নামক একটি স্থান ছিল। ধারণা করা হয় যে, টায়রা বা তুরান নাম থেকেই বাদশাহ কন্যার নামকরণ করা হয় তুরান দোখত্। ফেরদৌসির শাহনামায় এই রাজকন্যার জীবনীর চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তুরান দোখত্ তাঁর রূপ-মাধুর্য, মননশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ও রুচিবোধের অসাধারণ পরিচয় দিয়েছিলেন বলেই এশিয়া ও ইউরোপে তাঁর সুনাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। (Rose, 1998: 29-54)

সি দোখত্ ও রুদাবাঃ

আছে দয়াবতী সীদোখত্ এর কাহিনী। যিনি মেহরাবের স্ত্রী এবং রুদাবার মা হিসেবে শাহনামায় পরিচিতি পেয়েছেন। কবি এখানে সীদোখত্ ও রাজকন্যা রুদাবার সৌন্দর্য বর্ণনায় বলেছেন, তাদের রূপ-সৌন্দর্য যেন বসন্তের ফুলবাগিচার ন্যায়। সীদোখতের রক্তবর্ণ অধর যুগলের বর্ণনা পাওয়া যায় এতে। রুদাবার মাথায় চন্দ্রমণ্ডলের মতো এক সমুজ্জ্বল মুকুট তার সৌন্দর্য-শোভা আরও বর্ধন করেছে। রুদাবাকে কৃষ্ণনেত্রা (কালো চোখ) ও গোলাপতনু (গোলাপের ন্যায় শরীর যার) বলা হয়েছে। কবি শাহনামার একাধিক স্থানে সীদোখত্ এবং রুদাবার সৌন্দর্য বর্ণনায় তাদেরকে সূর্যমূখী ও চন্দ্রমূখী বলে সম্বোধন করেছেন। যার মাধ্যমে এই দুই নারীর সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। রুদাবার হৃদয়ে সামের পুত্র জালের প্রতি প্রেমানুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। (ইউসুফ, ১৯৯১ঃ ২২১-২২৩, ২৩৬)

মেহরাবের মাতামহ জোহাকের বর্ণনা এসেছে শাহনামায়। (ইউসুফ, ১৯৯১ঃ ২৪২) এসেছে গাশতাসাবের স্ত্রী কেতাউনের বর্ণনা। এই বর্ণনাগুলো থেকে আমরা নারী চরিত্রের কয়েকটি দিক খুঁজে পাই। যেমন নারী সৌন্দর্য্যের প্রতীক, নারী প্রেমময়, নারী ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারি এবং নারী-পুরুষের পারস্পারিক সম্পর্ক, একে অপরের প্রতি গভীর প্রেমের অনুভূতি।

আইয়ূগ্বি

তিনি আনুমানিক হিজরি দশম শতাব্দীর একজন ইরানি কবি। তাঁর লেখা মহাকাব্য *ورقه و گلشاه* (*ওয়ারাকা ওয়া গোলশাহ*) একটি প্রেমের কাহিনী। এতে রয়েছে ২২৫০ টি পঙক্তি। এই গল্পে রয়েছে তরুণ ওয়ারকা ও তরুণী গোলশানের প্রেমের বর্ণনা। কবির জীবনী সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে তিনি গজনির সুলতান মাহমুদের সমসাময়িক বলে ধারণা করা হয়। আইয়ূগ্বির ভাষ্যমতে, *ওয়ারকা ওয়া গোলশাহ* গ্রন্থটি আরবিয় গল্প *অরওয়া ওয়া আফরা* গল্পের আলোকে রচিত একটি প্রেমকাহিনী। তবে কাহিনী বর্ণনায় দু'টোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এটি বাহরে মোতাক্বারেবে মুসাম্মানে মাহযুফ ইয়া মাকসুর অর্থ্যাৎ ফাউলুন ফাউলুন ফাউলুন ফাউল বা ফাআল ছন্দে রচিত। (গোলামরেযায়ি, ১৩৭০হি.শাঃ ৬৭-৭৫) ডক্টর যাবিউল্লাহ সাফা ১৩৪০ সালে এই কাব্যের ভূমিকা লেখেন এবং গ্রন্থটির সম্পাদনা সম্পন্ন করেন।

ওয়ারাকা এবং গোলশাহ সম্পর্কে চাচাতো ভাই বোন ছিল। ছেলেবেলা থেকেই একই গোত্রে তারা একসাথে বড় হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই কারণে তাদের উভয়ের পিতা-মাতা তাদের বিবাহ দিতে সম্মত হন। রাবি বিন আদনান নামক এক ব্যক্তি, যে গোলশাহকে পছন্দ করতো, সে তাদের বিবাহের দিন আক্রমণ করে এবং গোলশাহকে অপহরণ করে তার সাথে নিয়ে আসে এবং ধন-সম্পদ, মণি-মানিক্য উপহার স্বরূপ তাকে দেয়। এমতবস্থায়, গোলশাহ রাবি বিন আদনানের সাথে মিথ্যা অভিনয় করে যে, সেও আদনানের প্রতি ভালোবাসায় আসক্ত। ওয়ারাকা এবং রাবির মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সেই যুদ্ধে রাবি মৃত্যুবরণ করে। পরবর্তীতে ওয়ারাকা মৃত্যুবরণ করে। গোলশাহ ওয়ারাকার মৃত্যু সংবাদ শুনে তার সমাধিস্থলে ছুঁটে যায় এবং বিলাপ করতে থাকে। আর এভাবে সেও মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু গল্পে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুল সা. এর দোয়া এবং খোদার রহমত ও আদেশে তারা পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠে। (irna.ir)

এই গল্পে একজন নারীর প্রতি প্রেমাসক্তি কতো বিশাল যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি করতে পারে সে সম্পর্কে আমরা ধারণা পাই। এখানে গোলশাহ নামক নারী প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

ফখরুদ্দিন আস'আদ গোরগানি

ফখরুদ্দিন আস'আদ গোরগানি পঞ্চম হিজরির প্রথমার্ধের একজন ইরানি কবি, যিনি উত্তর ইরানের গোরগান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সেলজুকি যুগে অর্থ্যাৎ মিকাইল সেলজুকের পুত্র সুলতান আবু তালেব তুঘরিলের শাসনামলে তাঁর কাব্যপ্রতিভা বিকশিত হয়। (কাফাফি, ১৩৮২হি.শা: ২৬৬)

তার জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে তিনি ইসফাহান শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। ইসফাহানের তৎকালিন গভর্নর ছিলেন আমিদ আবুল ফাতাহ্ মোযাফফার, যার সাথে গোরগানির সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তার অনুরোধে গোরগানি *ভিস ওয়া রামিন* গল্পের ছন্দ্যেবদ্ধ রূপ দান করেন। রোমান্স ধারার এ গল্পটি পারস্য সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। (en.m.wikipedia.org) গোরগানির ভাষায়-

এটি প্রাক-ইসলামি যুগে পাহলভি ভাষায় রচিত অত্যন্ত সুমিষ্ট একটি প্রেমের গল্প; যার তুলনা এটি নিজেই। কিন্তু তা পাহলভি ভাষায় লিখিত, যা আমার বোধগম্য নয়। যদি কেউ এই ভাষা পড়তে জেনেও থাকে; তবুও এর অর্থ পূর্ণরূপে উদ্ধার করা বেশ দুর্বোধ্য থেকে যাবে। এ অঞ্চলে কেউ কি আছে যে এই পাহলভি ভাষা আমাদের শেখাবে? এই সুমিষ্ট কাব্যের রসাস্বাদন করাবে? (কাফাফি, ১৩৮২হি.শা: ২৬৬-২৬৭)

গল্পের মূল চরিত্রে রয়েছে ভিস ও রামিন নামক নায়ক-নায়িকা। ভিস হচ্ছে শাহরু এবং কারুন দম্পতির কন্যা; এই পরিবারটি পশ্চিম ইরানের মাহ্ (মিডিয়া) অঞ্চলের শাসন কার্যে নিয়োজিত ছিল। রামিন ছিল ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মারভের রাজা মোভেদ মেনিকানের ভাই। মেনিকান একদিন এক রাজকীয় অনুষ্ঠানে শাহরুকে দেখে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। শাহরু জানায় সে বিবাহিত। তবে সে মেনিকানের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয় যে, যদি তার কোনো কন্যা সন্তান জন্মলাভ করে তবে সে তার কন্যাকে মেনিকানের হাতে তুলে দেবে। সেই ওয়াদা অনুযায়ী ভিসকে মেনিকানের দরবারে পাঠানো হয়। সেখানে ভিস এবং রামিন একসাথে বেড়ে উঠতে থাকে। পরবর্তীতে ভিস তার মায়ের কাছে ফিরে যায় এবং নাবালক বয়সে ভিরুর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কারণ মেনিকানের সাথে ভিসের বয়সের তফাৎ বেশ অনেকটা হওয়ায় ভিসের পরিবার তাদের বিয়ের বিষয়ে

আপত্তি জানায়। এই ঘটনা শুনে মেনিকান তার সৈন্য পাঠায় এবং শাহরুকে তার ওয়াদার কথা মনে করিয়ে। তবে সে তার ওয়াদা অস্বীকার করে। এর ফলে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এতে ভিসের বাবা কারুন মৃত্যুবরণ করে। মেনিকান ভিসকে বিবাহের জন্যে অনুরোধ করলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। মেনিকান তার দুই ভাই যার্দ ও রামিনের উপদেশ কামনা করে। ঘটনাক্রমে রামিন পূর্বেই ভিসের প্রেমাসক্ত ছিল। সে মেনিকানকে বুঝিয়ে ভিসকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। তবে যার্দের কথামত মেনিকান শাহরুকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দিয়ে তার মেয়েকে নিয়ে আসে। তবে ভিস একটি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কবচ দ্বারা মেনিকানের পৌরুষত্বকে দুর্বল করে রাখে। এদিকে মেনিকান যুদ্ধে গেলে রামিনের সাথে ভিসের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু এই সম্পর্কের কোনো ভবিষ্যত না থাকায় রামিন গোল নামক এক নারীকে বিবাহ করে। তবে দাম্পত্য সুখ অনুভব করতে না পেরে ভিসের কাছে উপস্থিত হয়। মেনিকান ও যার্দের মৃত্যুর পরে ভিস ও রামিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং রামিন মারভের সিংহাসনে আরোহণ করে। (গোলামরেযায়ি, ১৩৭০হি.শা: ১৫২-১৫৫)

এই গল্পের প্রধান চরিত্রে রয়েছে ভিস। গল্পটিতে তার এবং তার মায়ের সৌন্দর্যের কথা এসেছে। একজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে পাবার জন্যে রাজবংশীয় দু'টি পরিবারে সৃষ্টি হয়েছে দ্বন্দ্ব এবং যুদ্ধ বিগ্রহ। যদিও পরবর্তীতে গল্পের প্রধান দুই চরিত্র ভিস এবং রামিনের ভালোবাসা পূর্ণাঙ্গ পরিণতি পায়।

নিযামি গাঞ্জুভি

দ্বাদশ শতকের একজন ইরানি কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন নিযামি গাঞ্জুভি। গবেষকগণের মাঝে তাঁর নাম নিয়ে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। যাবিউল্লাহ সাফা রচিত তারিখে আদাবিয়াতে ইরান গ্রন্থে তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাম জামাল উদ্দিন আবু মুহাম্মাদ ইলিয়াস বিন ইউসুফ বিন যাক্কি বিন আল মুয়াইয়েদ নিযামি হিসেবে পাওয়া যায়। (কাফাফি, ১৩৮২হি.শা: ২৬৯) এছাড়াও হাকিম নিযামি গাঞ্জুভি, ইলিয়াস বিন ইউসুফ নিযামি হিসেবেও পরিচিত। তবে কবিনাম হিসেবে তিনি নিযামি নামটিকেই বেছে নিয়েছেন। তিনি ফারসি সাহিত্যে রোমান্সধর্মী মহাকাব্য রচনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন।

নিযামি ৫৩৫ হিজরি কামারি মোতাবেক ১১৪১ সালে সেলজুক শাসনামলে গাঞ্জ শহরে (বর্তমান আযারবাইযান) জন্মগ্রহণ করেন। ১২০৯ সালে ৬৮ বছর বয়সে ঐ একই শহরে মৃত্যুবরণ করেন। (Moin, 2006: 2)

নিযামি গাঞ্জুভির প্রেমোপাখ্যানমূলক সাহিত্যকর্মের মধ্যে *খসরু ওয়া শিরিন* (খসরু ও শিরিন) এবং *লাইলি ওয়া মাজনুন* (লাইলি ও মজনু) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাকিম নিযামি ৫৭৩ হিজরি সালে অর্থ্যাৎ সুলতান তুঘরিল বিন আরসালানের শাসনামলে *খসরু ও শিরিন* কাব্য রচনা শুরু করে ৫৭৬ হিজরিতে সমাপ্ত করেন। (নিযামি, ১৩৮৩ হি.শা: ৮)

খসরু ও শিরিন গল্পটির শিরোনাম অনেক সাহিত্যিক *শিরিন ও ফরহাদ* হিসেবে নামকরণ করেছেন এবং তা চলচ্চিত্র হিসেবেও প্রচারিত হয়েছে। এই গল্পের ঘটনাবলি ফেরদৌসির *শাহনামায়* বর্ণিত রয়েছে। গল্পের মূল চরিত্রগুলো অপরিবর্তনীয় রেখে কবি-সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন আঙ্গিকে এই প্রেম কাহিনীর বর্ণনা করেছেন।

গল্পের সূচনায় দেখা যায় যে, খসরু স্বপ্নে তার দাদা আনুশিরওয়ানকে দেখে। দাদা তাকে শিরিন নাম্নি একজন স্ত্রী, শাব্দিয নামের একটি ঘোড়া, বারবাদ (বারবাত বাদ্যযন্ত্র হিসেবে পরিচিত) নামক একজন সুরকার এবং বিরাট ইরান রাজ্য দান করছেন। (Encyclopedia Iranica)

'শাপুর ছিলেন খসরুর অত্যন্ত কাছের বন্ধু এবং তার মাধ্যমেই খসরু ও আর্মেনিয় রাজকন্যা শিরিনের পরিচয় হয়। শিরিনের অপরূপ সৌন্দর্যে খসরু বিমোহিত হয় যা পরবর্তীতে প্রেমের সম্পর্কে রূপ নেয়। খসরুর রাজ্যে ফরহাদ নামক একজন ভাস্কর ছিল, সেও শিরিনের প্রেমাসক্ত হয়। তবে খসরুর ষড়যন্ত্রে ফরহাদের কাছে শিরিনের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ পাঠানো হলে তা শুনেই ফরহাদ আত্মহননের পথ বেছে নেয়। খসরুর প্রথম স্ত্রীর পুত্র শিরোয়ে রাজকন্যা শিরিনের প্রেমে পড়ে। শিরোয়ে তার পিতা খসরুকে হত্যা করে শিরিনকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। শিরিন সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আত্মহত্যা করে। খসরু ও শিরিনকে একই কবরে সমাধিস্থ করা হয়। (গোলামরেযায়ি, ১৩৭০হি.শাঃ ২০৯-২১১)

এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছে একজন নারী 'রাজকন্যা শিরিন'। যার সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে কতগুলো পুরুষের জীবনাবসান ঘটলো। মানব মন সৌন্দর্য প্রিয় আর তাই সে বারংবার আকর্ষিত হয় সেই সুন্দরের প্রতি। নারীর ভালোবাসার পবিত্রতা ও গভীরতা উপলব্ধি করা যায় এ গল্পের মাধ্যমে। একে অপরের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, এই ভালোবাসা তারই সাক্ষ্য দেয়।

নিযামি গাঞ্জুভি রচিত *লাইলি ওয়া মাজনুন* গল্পটি *খসরু ওয়া শিরিন* থেকে পুরোপুরি ভিন্নধর্মী একটি সাহিত্য। খসরু ও শিরিনে রয়েছে মানবীয়, পার্থিব প্রেমের কাহিনী। যা নর-নারীর মাঝে বিদ্যমান ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। অপরদিকে লাইলি ও মজনুতে আধ্যাত্মিক প্রেমের স্ফুরণ ঘটেছে। আরবি *মাজনুন লাইলি* থেকে *লাইলি ওয়া মাজনুন* নামে ফারসি, টার্কিশ, ইংরেজি সহ বহু ভাষায় রচিত ও অনুদিত হয়েছে। আরবিয় মৌলিক এই কাহিনীকে সাহিত্যকারগণ নিজেদের শৈল্পিক গুণে নানা আঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। নিযামি ৫৮৫ হিজরি মোতাবেক ১১৮৮ সালে এই অনবদ্য প্রেমকাহিনী রচনা করেন। যা ছিল মূলত ৭ম শতকের আরবিয় কবি কায়েস ইবনে আল মোলাভ্ভা এবং তার প্রেমিকা লায়লা বিনতে মাহদির প্রেমকাহিনী। কায়েস ও লায়লা তাদের যৌবনকালে একে অপরের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। আর তাই কায়েসের 'বনু আমির' গোত্রের লোকেরা তাকে মজনু (পাগল, প্রেমিক) উপাধি দেয় এবং ধারণা করেছিল যে, কায়েস (মজনু) জিন দ্বারা আবিষ্ট। (Seyed-Gohrab, 2003: introduction) লায়লার বাবা তাদের প্রেমের বিরোধিতা করেন এবং ওয়ার্দ আলতাক্বাফি নামক এক সুদর্শন, ধনী, আরবিয় বণিকের সাথে লায়লাকে বিবাহ দেন। মজনু লায়লার প্রেমাসক্ত হয়ে প্রায়শই কবিতা লিখতো এবং এতে সরাসরি লায়লার নামোল্লেখ করতো। লায়লার বিবাহের খবর শুনে মজনু তার নিবাস ছেড়ে মরুভূমিতে পাড়ি জমায় এবং মরুভূমির তপ্ত বালুকায় কবিতার পংক্তি রচনা করতে থাকে। লায়লা তার স্বামীর সাথে উত্তর আরবের কোনো এক অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে। তবে প্রেমিকের বিচ্ছেদে ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এই প্রেমকাহিনীর কিছু বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, লায়লা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। পরবর্তীতে ৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে লায়লার সমাধিস্থলে মজনুর মৃতদেহ পাওয়া যায়। সেখানে মজনু রচিত একটি কবিতার ৩টি পংক্তি পাওয়া যায়। (Ganjavi, 2002: 77-79) মজনু সম্পর্কে একটি তথ্য প্রচলিত আছে যে, লাইলির প্রেমে পাগলপ্রায় মজনু লাইলি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলতো না। একটি পংক্তি দ্বারা বিষয়টি তুলে ধরা হলো:

از هر نمطی که قصه می خواند

جز در لیلی سخن نمی راند

(গোলামরেযায়ি, ১৩৭০হি.শা: ২৩৬)

বঙ্গায়নঃ

যে উপাখ্যানই বিবৃত হোক না কেন,

তা লাইলির প্রেমের দিকেই নিরন্তর ধাবিত হত।

প্রেমাস্পদের কথা ছাড়া আর যাই বলা হয়ে থাকুক না কেনো, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মজনুর কাছে তা মূল্যহীন। যে কাহিনী সে বর্ণনা করতো, যেকোনো পন্থায়ই হোক তাতে লাইলির প্রতি প্রেম নিবেদনই মুখ্য বিষয় হিসেবে ধরা উচিৎ। লাইলি ছাড়া মজনু আর অন্য কথা বলতো না। মজনুর অন্তর্জগৎ জুড়ে ছিলো লাইলির উপস্থিতি।

নিযামি গাঞ্জুভি ছাড়াও আমির খসরু দেহলাভি ১২৯৯ সালে রচনা করেছেন *মাজনুন ওয়া লেইলি*। জামির শৈল্পিক ছোঁয়ায় ১৪৮৪ সালে ৩৮৬০ পংক্তিমালায় রচিত হয়েছে এই কাব্য। লাইলি ও মজনু প্রেমকাহিনী রচনা করেছেন মাকতাবি শিরাজি, হাতেফি, ফুযুলিসহ আরও অনেকে। যেগুলো অটোমান-তুর্কি ও ভারতে ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়েছে। (en.m.wikipedia.org)

তৎকালিন বঙ্গ অঞ্চলের দৌলত উজির বাহরাম খাঁ বিরচিত *লাইলী মজনু* কাব্যটি পরবর্তীতে সম্পাদনা করেছেন আহমদ শরীফ। আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে *লাইলি মজনু* প্রেমকাহিনীর একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন, তার কিছু অংশ বিধৃত হলো:

আরম্ভের পংক্তিঃ মহত জনের মুখে শুনেছি কথন

এই ভব ভাণ্ডারে বচন মহাধন।

শেষ পংক্তিঃ লায়লি লায়লি বলি হইল নৈরাশ

মজনু ঘরেতে রৈল ছাড়িয়া নিশ্বাস।

(বাহরাম খাঁ, ১৯৫৮: ৪)

লাইলি মজনু প্রেমকাহিনী নিয়ে ১৯২২ ও ১৯২৭ সালে নির্মিত হয় ভারতিয় নির্বাক চলচ্চিত্র, ১৯৩১ সালে ভারতিয় হিন্দি, ১৯৩৩ সালে মালায়ান মালয়, ১৯৪৯ সালে ভারতিয় তেলেগু, ১৯৫৭ সালে পাকিস্তানি, ১৯৬০ সালে তাজিক- সোভিয়েত , ১৯৬১ সালে সোভিয়েত-আযারবাইযানি এবং ১৯৬২ সালে নির্মিত হয় ভারতিয় মালালায়াম চলচ্চিত্র। একই গল্প অবলম্বন করে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে নির্মিত হয় এই জনপ্রিয় চলচ্চিত্রটি; যেগুলো দর্শকের মনে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। (en.m.wikipedia.org) (Laila Cinemaazi.) Retrieved 6 may 2021.

এই কাহিনীতে নর-নারীর পার্থিব প্রেমের পরিসমাপ্তি ঘটেছে অপূর্ণতার মধ্য দিয়ে। জাগতিক অর্থে মানব-মানবীর মিলন না ঘটলেও তাদের আত্মার মিলন ঘটেছে। পরিপূর্ণরূপে না পেয়েও তারা একে অপরের অন্তরের গভীরে স্থান করে নিয়েছে।

শেখ সাদি

আবু মোহাম্মাদ মোসলেহ উদ্দিন বিন আব্দুল্লাহ সিরাজি ছিলেন সিরাজের অধিবাসি। তিনি একজন ইরানি কবি; তাঁর রচিত গদ্যে-পদ্যে রয়েছে সামাজিক ও মানবীয় চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। সাদি মূলত তাঁর রচিত সাহিত্যের জন্যেই প্রসিদ্ধ, কেননা তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মানব সমাজে পৌঁছেছে জ্ঞান ও মানবতার বার্তা। সাদি মানবতার কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। যুগশ্রেষ্ঠ এ দার্শনিকের জন্ম ৫৮০ হিজরি মোতাবেক ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইরানের সিরাজ নগরীতে এবং ৬৮২ হিজরি মোতাবেক ১২৮৬ খ্রিস্টাব্দে নিজ বাসভূমিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ সিরাজি ছিলেন সিরাজের শাসক আতাবেক সাদ বিন জাঙ্গির অধীনস্ত একজন কর্মচারি। (রাযমজু, ১৩৮২ হি.শা: ৫২)

সেই সূত্রে কবি জীবনে সাদি এই উদার চিত্তের শাসকের দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে নিজের নামের সাথে সাদি নামটি যুক্ত করেছেন। পরবর্তীতে তিনি কবিনাম হিসেবে সাদি নামটি ব্যবহার করে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর রচিত কালজয়ী দু'টি গ্রন্থ: *গোলেস্তান* (৬৫৫হি.) ও *বুস্তান* (৬৫৬হি.) মূলত কুরআন-হাদিসের কাব্যিক তাফসির। ফারসি সাহিত্যের অমূল্য এ সম্পদ দু'টি হচ্ছে আত্মদর্শনমূলক সাহিত্য; যা নৈতিকতা, দৈনন্দিন জীবন পদ্ধতি প্রণয়ন এবং মানব সত্ত্বা হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে আরোহণের পথ বাতলে দেয়। নীতিকথামূলক তাঁর সাহিত্যে তিনি বেশ কয়েক স্থানে নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কখনো নারী এসেছে স্ত্রী হিসেবে, কখনোবা এসেছে মা ও প্রেমিকারূপে। নৈতিকতামূলক শিক্ষনীয় বিষয়াবলি আলোচনার সুবিধার্থে কাহিনীকারে বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি তুলে ধরা হলো:

আশেকের চোখে মাশুকের সম্মান সম্বন্ধে একটি গল্প এরূপ:

দুই চাচাতো ভাইবোন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল এবং উভয়েই ছিল সুশ্রী। স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট থাকলেও স্বামী স্ত্রীর প্রতি একেবারেই আগ্রহী ছিল না। মেয়েটি নিজেকে সুসজ্জিত করে রাখত তবে ছেলেটি তার দিকে ফিরেও তাকাতো না বরং স্রষ্টার কাছে নিজের মৃত্যু কামনা করতো। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যকার দূরত্ব বেড়ে গেলে বুযুর্গগণ যথাযথ মোহরানা পরিশোধ করে বিবাহ বিচ্ছেদের পরামর্শ দান করেন। স্বামী এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হয়ে বলে যে, একশত বকরির বদলে যদি কয়েদখানা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তবে এর চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারেনা। কিন্তু স্ত্রী এ প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত না হয়ে জানিয়ে দেয় যে, কোনো কিছুর বিনিময়েই সে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে রাজি নয়। স্বামীর অন্যায় আচরণ ও অবহেলা সহ্য করে স্বামীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা আমার দায়িত্ব এবং একশত কেনো ত্রিশ হাজার বকরির বিনিময়েও আমি আমার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে রাজি নই।

تو را هر چه مشغول دارد ز دوست

اگر راست خواهی دلارامت اوست

(ganjoor.net- বুস্তান, বা'বে সেভভোম দার এশক ও মাস্তি ও শোর, বাখশে ১৪, হেকায়াত দার মানিয়ে ইয্যাতে মাহবুব দার নাযারে মাহাব)

বঙ্গায়নঃ বন্ধুর কাছ থেকে যা পেয়ে অন্তর পরিতৃপ্ত থাকে

সত্য এটাই, মাশুক বলে তাকে।

এ গল্পে একজন স্ত্রীর বলিষ্ঠ মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। বিবাহের মত পবিত্র বন্ধনের মর্যাদা কিভাবে আদায় করতে হয়, তার শিক্ষাই পাঠক গ্রহণ করেছে।

শেখ সাদি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একটি বিষয় আলোচনা করেছেন এভাবে-

সাদির সহধর্মিনী স্বভাবে অত্যন্ত উগ্র ও মুখরা রমণী ছিলেন। যার ফলে তাঁদের দাম্পত্য জীবন অনেকটাই বিষাদময় হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর *গোলেস্তান* গ্রন্থে বলেছেন-

زن بد در سرای مرد نکو

هم در این عالم است دوزخ او

زینهار از قرین بد زنهار

و قنا ربّنا عذاب النار

(সাদি সিরাজি, ফোরুগ্বি, ১৪০০ হি.শা: ৬৮)

কাব্যানুবাদঃ

নেক লোকের ভাগ্যে যদি জুটে বদ স্বভাবের স্ত্রী,

দোযখ হয়ে উঠবে তার পৃথিবী।

সাবধান! এই অনিষ্ট হতে সাবধান!

হে আল্লাহ দোযখের আগুন থেকে দাও পরিত্রাণ।

বাধ্যগত সৎ স্ত্রী যার ঘরে রয়েছে, সে পুরুষ দুনিয়ায় রাজা হয়ে যায়। সারাদিন কঠোর কায়িক পরিশ্রম করলেও তার মনে থাকে অফুরন্ত শান্তি। নেক স্বভাবের কম সুশ্রী স্ত্রী বদ স্বভাবের অপরূপা স্ত্রীর চেয়ে ঢেড়গুণ উত্তম। (শেখ সাদী, মো: হাসান, ২০০৬: ২১৫-২১৬)

সাদির নীতিকথামূলক গল্পের মধ্যে রয়েছে এক অবাধ্য সন্তান ও মায়ের মধ্যকার কথোপকথন, যা সন্তানকে জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করে। একদা এক যুবক তার মায়ের অবাধ্য হয়ে উচ্চস্বরে কথা বলছিল যার কারণে মায়ের মনে আঘাত লাগে। অতঃপর মা তার সন্তানকে তার শৈশবের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। শিশু অবস্থায় ছেলেটির অসহায়ত্ব এবং মাতৃস্নেহে ছেলেকে বড় করে তোলার অভিজ্ঞতার বিষয়টি ছেলেকে জানান। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পর মানুষের অসহায়ত্ব এবং সামান্য কীটের খাদ্যে পরিণত হওয়া মানুষদের যে আত্মগরিমা

রাখতে নেই সে বিষয়ে উপদেশ দেন। স্রষ্টা মানবজাতিকে পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করেছেন। যার মাধ্যমে সে সত্য-মিথ্যা. ন্যায়-অন্যায়ের বিভেদ বুঝতে সক্ষম। শারীরিক সৌর্যের দাম্ভিকতায় অন্ধ না হয়ে স্রষ্টার দেখানো পথ অনুসরণ করে চলাই প্রকৃত মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। (শেখ সাদি, নিজামী, ২০১৭: ১৪৩)

সাদি তাঁর *বুস্তানে* লাইলি মজনুর প্রেমকাহিনী নিয়ে বেশকিছু উক্তি করেছেন। ছোট্ট একটি ঘটনা তুলে ধরা হলো:

একদিন জনৈক ব্যক্তি মজনুকে লাইলির গোত্রে আসতে না দেখে প্রশ্ন করে যে, সে কি লাইলিকে ত্যাগ করে অন্য কারো প্রেমে মত্ত হয়েছে কিনা? অশ্রুসিক্ত হয়ে মজনু জবাব দিল, প্রেমিকা থেকে দূরে থাকাটা ধৈর্যশালী হওয়ার পরিচয় দেয়না বরং অনেক সময় দূরত্ব বজায় রাখাটা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। মজনুর ভাষায়-

نه دوری دلیل صبوری بود

که بسیار دوری ضروری بود

(কুল্লিয়াতে সাদি, *বুস্তান*, বা'বে সেভভোম, বে মাজনুন কাসি গোফত কেই নিক পেই)

অর্থ্যাৎ দূরে থাকা মানে ভুলে যাওয়া নয়। অনেক সময় বিশেষ কারণে বাধ্য হয়েও দূরত্ব অবলম্বন করে চলতে হয়।

শেখ সাদি তাঁর গদ্য ও পদ্যের বিভিন্ন স্থানে নারীকে উপস্থাপন করেছেন নানা আঙ্গিকে নানা বৈচিত্র্যে। প্রেমিকা, স্ত্রী, মা হিসেবে জীবনে চলার পথে একজন নারীর অস্তিত্ব ও অবদানের কথা সাদির লেখনীতে উঠে এসেছে বারংবার।

হাফিয সিরাজি

খাজা শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ হাফিয সিরাজি মূলত তাঁর কবিনাম হাফিয হিসেবেই অধিক পরিচিত। তাঁর জন্ম-মৃত্যুর সঠিক তারিখ নিরুপনে ইরানি পণ্ডিত গণের মাঝেও রয়েছে নানা মত। ইরানের সিরাজ নগরীতে আনুমানিক ১৩২৫ সালে বা ৭৯১ হিজরি মোতাবেক ১৩৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। তাঁর মাযার দর্শনার্থিদের নিকট অত্যন্ত আকর্ষনীয় ও পবিত্র স্থান হিসেবে পরিচিত। পারস্যবাসীর কাছে তিনি 'বুলবুল-ই-সিরাজ', 'লিসানুল গায়েব' (অজ্ঞাতের বাণী), 'তর্জমানুল আসরার' (রহস্যের মর্মসন্ধানি) নামে সমধিক পরিচিত। গযল সম্রাট হাফিযের মোহনীয় গযলে এসেছে নারী রূপের বাখান। কখনো তিনি সরাসরি নারীর সৌন্দর্য নিয়ে লিখেছেন আর কখনোবা প্রকৃতির সৌন্দর্যের সাথে নারীর তুলনা করেছেন। স্রষ্টার প্রেমে মত্ত হয়ে তিনি তাঁর লেখনীতে এমন কিছু উপমা এনেছেন; যেগুলো নারীর সাথে অধিক সাযুজ্যপূর্ণ। তাঁর গযলের এমন কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো:

الایا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

به بوی نافه ای کاخر صبا زان طره بگشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها

(হাফিযের গযল : ১)

বাঙলায়ন:

হে সাকি! পানপাত্র নিয়ে বিলাও শরাব আর দাও আমায়

শুরুতে প্রেম সহজ হলেও তার পথ জর্জরিত নানা সমস্যায়।

প্রেয়সীর যুলফ্, কোঁকড়ানো চুলের বেনুণী যেন কস্তুরির সুবাসযুক্ত,

প্রেয়সীর বিরহ যাতনায় কতো প্রেমিকের হৃদয় হচ্ছে রক্তস্নাত।

আপাত দৃষ্টিতে এই গযলের ভাবার্থ পাঠকের চোখে ধরা পড়ে নারীর সৌন্দর্যের বিবরণ হিসেবে। তবে হাফিয এর দ্বারা স্রষ্টার রূপের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন।

আরও একটি গযলে এসেছে-

مبین به سیب زنخدان که چاه در راهست کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا

(হাফিযের গযল : ২)

অর্থ:

রূপসীর গালের টোলের দিকে দৃষ্টিপাত করো না; কেননা তা কূপ (বিপদ) বৈ কিছু নয়;

এত তাড়াহুড়ো করে হে হৃদয়, তুমি যাচ্ছ কোথায়?

নারীর গালের টোল ও তার মায়াবি হাসি পুরুষের মন কেড়ে নেয়। তবে এই হাসি আর তার সৌন্দর্যে রয়েছে ফাঁদ। তাই হাফিয সুচিস্মিতা নারীর গালের টোলের দিকে তাকাতে নিষেধ করেছেন।

হাফিযের গযলে এসেছে-

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکناباد و گلگشت مصلا را

فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب چنان بردند صبرزان دل که ترکان خوان یغما را

من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را

(হাফিযের গযল : ৩)

অর্থ:

হৃদয় হরণকারি সিরাজের ঐ তুর্কি প্রেয়সীর কালো তিলের বিনিময়ে

সামারকান্দ ও বোখারা আমি দেব বিলিয়ে।

দাও আমায় সাকি! শরাব আছে যেটুকু বাকি;

হয়তো জান্নাতেও মিলবেনা রোকনাবাদের স্রোতস্বীনীর সেই তীর

আর পুষ্পে ঘেরা সিরাজের মোসাল্লা নগরীর।

সুন্দরী গায়িকা ও শহর মাতানো প্রিয়দর্শীনীরা হৃদয়কে ধৈর্যহারা করে তোলে এমনভাবে

রাজকীয় ভোজ দ্রুত ফুরিয়ে যায় যেভাবে।

ইউসুফের ক্রমবর্ধমান সৌন্দর্য সম্পর্কে আমি জানি,

যা জুলায়খাকে করে তুলেছে নিষ্কলুষ-সতীত্বের অধিকারিনী।

ফারসি ভাষাবিদ ও পারস্য সাহিত্যের পণ্ডিত ড. মুহাম্মদ মঈন (১৯১৮-১৯৭১খ্রি.) তোর্কে সিরাজি বলতে তুর্কি গোলাম ও কানিজদের বুঝিয়েছেন, যাদের সৌন্দর্যে হৃদয় প্রেমিক হয়ে ওঠে। সুশ্রী গায়িকাদের গানের সুরে গোটা শহরবাসী বিমোহিত হয়ে যায়। ইউসুফ নবির সৌন্দর্যে বিবি জুলায়খা যেমন সীমালঙ্ঘনকারি-ব্যভিচারি হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে ইউসুফের প্রেমের বিরহে ও আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে দুনিয়াবি কাম-লালসার অনেক উর্দ্ধে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আব্দুর রহমান জামি

তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাম নূরুদ্দিন আব্দুর রহমান বিন নিযামুদ্দিন আহমাদ বিন শাসমুদ্দিন মোহাম্মাদ দাশতি। তবে তিনি তাঁর কবিনাম 'জামি' নামেই অধিক পরিচিত। তিনি ফারসি সাহিত্যাঙ্গণের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যিনি তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ও অধ্যাত্নবাদে সিক্ত সুফি সাহিত্যের জন্যে স্মরণীয়। জামি ৮১৭ হিজরি মোতাবেক ১৪১৪ খিস্টাব্দে ইরানে জন্ম নেন এবং ৮৯৫ হিজরি মোতাবেক ১৪৯২ খিস্টাব্দে আফগানিস্তানের হেরাতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন ফারসি সুফি সাহিত্যের এক অনবদ্য সাহিত্যকর্ম *ইউসুফ ও জুলেখা* কাব্য। যার মূল উপকরণ নেয়া হয়েছে পবিত্র কুরআনের সূরা ইউসুফ থেকে।

কুরআনে বিভিন্ন তাৎপর্যমূলক ঘটনা বিভিন্ন সূরার শিরোনামে নাযিল হয়েছে। যা মানব সভ্যতাকে সঠিক পথনির্দেশনা দান করে। ১১১ আয়াত বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ সূরায় ইউসুফ নবি ও জুলেখা বিবির জীবনী ও তৎকালিন মিশরের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণ এসেছে। ইউসুফ জুলেখার কাহিনী আসমানি কিতাব তাওরাতের ৩৭ নং বা'ব (অধ্যায়) থেকে ৫০ নং বা'বে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ লিপিবদ্ধ রয়েছে। (নিকুবাখত, ১৩৭৭ হি.শা: মোকাদ্দেমে: ৭)

পবিত্র কুরআনে সুরা ইউসুফ নামে যে পূর্ণাঙ্গ সুরাটি নাযিল হয়েছে তাতে ইউসুফ নবি এবং জুলেখা বিবির জীবনের ঘটনা বর্ণিত রয়েছে এবং কুরআন মাজিদে একে 'আহসানুল কাসাস' বা সর্বোত্তম কাহিনী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। (সুরা: ইউসুফ, আয়াত: ৩ এর বঙ্গানুবাদ) কুরআনিক কাহিনী অবলম্বনে জামি সৃষ্টি করেছেন অসাধারণ এক কাব্য, যা পরবর্তীতে আরও অনেক কবি-সাহিত্যিক তাদের নিজস্ব ঢঙে রচনা করেছেন। ইসলাম প্রবর্তিত হওয়ার পর

সুরা ইউসুফ পৃথকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। আহমাদ গাযালি, ইমাম ফাখর্ রাযি, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন যায়েদ তুসি সুরা ইউসুফের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। (গোলামরেযায়ি, ১৩৭০হি.শা: ৮৯)

ইউসুফ আ. হলেন হযরত ইয়াকুব আ. এর পুত্র। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অসাধারণ সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। বাল্যকালে ইউসুফ ভাইদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন এবং ঘটনাচক্রে মিশরের বাদশাহ আযিযের আশ্রয় লাভ করেন। যৌবনদীপ্ত ইউসুফের সৌন্দর্যে আযিয পত্নী জুলেখা মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং ইউসুফকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করতে থাকেন। কিন্তু আল্লাহর নবি নিজেকে সংবরণ করে জুলেখার চাতুর্য এবং ব্যভিচারী কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা পেতে সমর্থ হলেও বাদশাহ আযিয নিজ পত্নীকে অন্যায়ভাবে বাঁচাতে ইউসুফকে সাজা প্রদান করেন এবং নবি কারাগারে বন্দি হন। ইউসুফ নবির প্রতি জুলেখার ভালোবাসা পরবর্তীতে সফল হয়। তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং দীর্ঘ প্রতিক্ষার পরে কাঙ্ক্ষিত মর্যাদা প্রাপ্ত হন।

ইউসুফ জুলেখা শিরোনামে অনেকেই কাব্য রচনা করেছেন। তন্মধ্যে আবুল কাসেম ফেরদৌসি, তুর্কি কবি হামাদি'র নাম উল্লেখযোগ্য। অনেকে এর মূল অনুলিপি থেকে অনুবাদকর্মও সম্পাদন করেছেন। তবে জামি রচিত গ্রন্থটিই অধিক খ্যাতি অর্জন করেছে। ফারসি কাব্য অবলম্বনে পঞ্চদশ শতকে অর্থ্যাৎ (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রি.) মধ্যবর্তী সময়ে শাহ মুহম্মদ সগীর যে *ইউসুফ জুলেখা* কাব্যটি রচনা করেছেন, তা মূলত প্রেমোপাখ্যান। ভারতীয় উপমহাদেশ হয়ে বাংলাদেশে এই কাব্যের সুখ্যাতি রয়েছে। জামির কাব্য থেকে সরাসরি অনুপ্রাণিত হয়ে আব্দুল হাকিম ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে *ইউসুফ জুলেখা* কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যের উৎস সম্পর্কে আব্দুল হাকিম লিখেছেন-

মোল্লা জামির বাক্য সিরেতে লইয়া।

আব্দুল হাকিমে কহে বাংলা রচিয়া ।।

ইছুপ জোলেখার কিচ্ছা হইল সমাপ্ত ।

ফারসি কিতাব ভাঙ্গি বাঙ্গালা পদস্থ ।।

(আহমদ, ২০০৯: ১২২)

মোল্লা আব্দুর রহমান জামির কাব্যধারা অনুযায়ি আব্দুল হাকিম বাংলা ভাষায় ইউসুফ জুলেখার কাহিনী রচনা করেন। অর্থ্যাৎ ফারসি গ্রন্থ বাংলায় নবরূপ লাভ করে। দোভাষী পুথির অদ্বিতীয় কবি হিসেবে খ্যাত শাহ গরীবুল্লাহর কলমের ছোঁয়ায় রচিত হয়েছে ইউসুফ জুলেখা, যা কোনো আক্ষরিক অনুবাদ নয়, বরং জামি রচিত মূল কাব্যের ভাবানুবাদ। (সরকার, ২০১৫: ১৩৮-১৩৯)

মোহাম্মদ হোসাইন শাহরিয়ার

তাঁর আসল নাম সাইয়েদ মুহাম্মদ হোসাইন বেহযাত তাবরিযি হলেও কবিনাম শাহরিয়ার নামেই অধিক পরিচিত তিনি। ২ জানুয়ারি ১৯০৬ সালে ইরানের তাবরিযে জন্ম নেন এবং ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ সালে তেহরানে মৃত্যুবরণ করেন। (হাদী, ২০১৫: ১৫, ৩১) ইরানের তাবরিযে তাঁর সমাধিস্থল 'মাকবারাতুশশোয়ারা' অবস্থিত। শাহরিয়ার এমন একজন কবি, যিনি ফারসি ও আযারবাইযানি ভাষার কাব্য রচনায় পারঙ্গম ছিলেন। কাব্য রচনায় বেশকিছু প্রেমের

কবিতা রচনা করেছেন। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে সুরাইয়া নামক এক রমনীর প্রেমের বিরহে পতিত হয়ে প্রেম ও বিরহমূলক কবিতা তিনি রচনা করেছেন।

একটি কবিতার অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো:

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا

অর্থ:

এসেছ! তোমার জন্যে জান আমার উৎসর্গিত, তবে এখন কেন

হে অবিশ্বস্ত, আমি তো নিরুপায় হয়ে গেছি; তবে কেন

ওহে স্নেহাস্পদ, তোমার অনুরাগে যৌবন দিয়েছি আমার

আমার সাথে নয়, অন্য যুবকদের সাথে ছলাকলা কর।

(সবুর, ২০২০: ৬৫)

কবি শাহরিয়ার প্রেমিকার অবিশ্বস্ততায় অভিমানি হয়ে তাঁর প্রিয়াকে ভর্ৎসনা করে কথাগুলো বলেছেন। বিগত যৌবনে কোনো নারীর আগমন বা প্রস্থান কোনো কিছুই কবিকে বিগলিত করতে পারেনি। নারীর প্রেমে অবহেলা ও তার পরিণতি বর্ণিত হয়েছে এ কবিতায়।

সোহরাব সেপেহরি

বিশিষ্ট কয়েকজন আধুনিক ইরানি কবিদের মধ্যে অন্যতম হলেন সোহরাব সেপেহরি। কাব্যরচয়িতা ও চিত্রশিল্পী হিসেবে একজন খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তিনি। ৭ অক্টোবর ১৯২৮ সালে ইরানের কাশান শহরে জন্ম নেন এবং ২১ এপ্রিল ১৯৮০ সালে ৫১ বছর বয়সে তেহরানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কাশানের 'মাশহাদে আরদাহালে' চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। (en.m.wikipedia.org)

সেপেহরি একজন প্রকৃতিপ্রেমী কবি ছিলেন। প্রকৃতির উপাদান-উপকরণই তাঁর কাব্যে ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছে। তিনি জীবনের কিছু কিছু সময়ে ছিলেন মার্কসবাদী এবং সর্বদা নিজস্ব চিন্তাধারা অনুযায়ি পথ চলতেন। (কাকানি, ১৩৭৬হি.শা: ৩৭)

সেপেহরির একটি কবিতা *صدای پای آب* (পানির কলধ্বনি) শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। যে কবিতায় তিনি নিজের জীবনীর বর্ণনা দিয়েছেন এবং প্রকৃতিকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কবিতার কয়েকটি চরণে নারীর কিছু রূপ ফুটে উঠেছে। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া। কবি তাঁর মা ও বোনের প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। কবিতাংশ তুলে ধরা হলো:

اهل کاشانم

روزگارم بد نیست

مادری دارم، بهتر از برگ درخت

مادرم بی خبر از خواب پرید، خواهرم زیبا شد.

অর্থ:

আমি কাশানের অধিবাসি

উপার্জন একেবারে খারাপ নয়;

আমার মা আছেন, যিনি গাছের পাতার চেয়েও উত্তম

মা আমার নিদ্রা থেকে বে-খবর, আমার বোন দেখতে সুন্দর।

কবিতায় মায়ের তুলনা করা হয়েছে গাছের পাতার সাথে। পাতা যেমন প্রকৃতিতে অক্সিজেন ছড়িয়ে দেয়, মায়েরাও ঠিক তেমনি। স্নেহ-মমতায় সন্তানের জীবন ভরিয়ে দেয়। অক্সিজেন যেমন শ্বাস নেওয়ার উপাদান, মায়েরাও সন্তানের ভালো ভাবে বেঁচে থাকার অবলম্বন। বরং তার চেয়েও অধিক কিছু। মায়েরা বিশ্রাম বোঝেনা, শুধু ব্যস্ত থাকেন সন্তানের মঙ্গল কামনায়। অপরদিকে কবি তাঁর বোনের সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

৩য় পরিচ্ছেদ

মাসনাভিতে নারীর অবস্থান ও চরিত্র বিশ্লেষণ

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির মাসনাভিকে বলা হয় পাহলভি ভাষার কুরআন। এটি কুরআন হাদিসের নির্যাস। মাসনাভি মূলত ঐশীবাণী পবিত্র কুরআন ও রাসুলের (সা.) মুখনিঃসৃত বাণীর কাব্যিক রূপ, যা রুমি নিজস্ব শৈলীতে রচনা করেছেন এবং এতে রয়েছে মানব জাতির জন্যে পথনির্দেশনা। স্রষ্টা নারী-পুরুষ উভয়কেই সমমর্যাদায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। ঠিক একই রকমভাবে রুমির লেখনীতেও নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য ও সমমর্যাদার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। মাসনাভির প্রথমাংশে এসেছে-

بشنو از نی چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند

کز نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند

শোন, বাঁশরির কাছে সে কি বলতে চায় অভিযোগের সুরে বিচ্ছেদের বিরহ গাঁথা শুনিয়ে যায়,

বাঁশবাগান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার করুণ সুরে সমগ্র নারী-পুরুষের হৃদয় যায় সিক্ত হয়ে।

মাসনাভিতে গল্পচ্ছলে ফুটে উঠেছে নীতিকথা ও উপদেশমূলক বাণী। নারীর চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, সামাজিক অবস্থান বিবেচনায় রেখে মাওলানা দারুন কিছু বিষয় উপস্থাপন করেছেন তাঁর দ্বিপদি কাব্যগ্রন্থে। যেগুলো মানবজাতিকে

পথ দেখানোর পাশাপাশি বুদ্ধিদীপ্ত করে তোলে। রুমি অত্যন্ত কৌশলী হয়েই নারী জাতির সামগ্রিক বিষয় তুলে ধরেছেন। কেননা এই বিষয়গুলোর মাঝে নারীর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে যেগুলোকে কাব্যিক ছন্দে উপস্থাপন না করে যদি স্পষ্ট ভাষায় বলিষ্ঠ লেখনীতে প্রকাশ করা হত, তাহলে নারী-পুরুষের মাঝে দ্বন্দ ও সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারতো। তবে ভাষার মাধুর্য অকাট্য ও দ্ব্যর্থবোধক বিষয়কেও সহজতর করে তোলে, আর এটিই রুমির কাব্যশৈলীর বিশেষত্ব। এজন্যেই বলা হয়েছে যে বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে মাসনাভির মর্মার্থ বুঝে নেওয়াটা অনেকটাই সহজসাধ্য বিষয়, কেননা তারা নিজেরা কৌশলী হওয়াতে নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা সহজেই তা উপলব্ধি করতে পারে। অপরদিকে জ্ঞান অপরিপক্ক যাদের, তাদের দ্বারা সেই রহস্য উদঘাটন করা ততটা সহজ নয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে নারীর গুরুত্ব ও অবস্থানের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েই আসছে। পৃথিবীতে নারীর অস্তিত্বের বিষয়টি মানবিকতা থেকে যোজন যোজন দূরেই অবস্থিত ছিল। তবে শান্তির বার্তাবাহক হযরত মুহাম্মদ সা. কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবরস্থ হওয়া থেকে নবজীবন দান করেন। নারীর মাঝে রয়েছে স্রষ্টার গুনের প্রতিভাস, সে বিষয়ে আলোকপাত করে আরবের অসভ্য সমাজের বর্বরতর নিয়মের সমাপ্তি টানেন তিনি। কন্যা সন্তান জন্মের বরকতময়তার বিষয়ে দুনিয়াবাসীর সম্মুখে ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে এ অনাচারের বিলুপ্তি ঘটিয়েছেন। (ফাতাহি, ১৩৯৩হি.শা: ৮৫-৮৬)

ইমাম গাযযালি নারী জাতির গুরুত্ব বোঝাতে মহানবি সা. এর একটি হাদিসের উল্লেখ করে বলেন-

''এই দুনিয়ায় তিনটি জিনিস আমার অত্যন্ত পছন্দনীয়। নারী (নারী জাতির প্রতিটি রূপ: মা, কন্যা সন্তান, বোন, স্ত্রী), খুশবু (আতর, সুগন্ধি), নামায (যা রাসুলের সা. চক্ষু মোবারকের জ্যোতি সদৃশ)''। আর মানবজাতিকেও তিনি এই জিনিসের প্রতি আগ্রহী ও যত্নবান হতে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর জীবনাচরণে আমরা কন্যা সন্তান প্রতিপালন ও দাম্পত্য জীবন যাপনের উত্তম পন্থা খুঁজে পেয়েছি। (Ghazali, 1376: 221)

স্বামী-স্ত্রীর মেলবন্ধন

মাসনাভিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে কোনো একটা গল্পে এসেছে- স্ত্রী তার স্বামীর দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতার কারণে অসন্তুষ্ট ছিল। স্বামী তার স্ত্রীকে অল্পে তুষ্ট থাকতে উপদেশ দেয়। কিন্তু তবুও স্ত্রী তার স্বামীর কথার মর্মার্থ বুঝতে ব্যর্থ হয়। স্বামী এ পর্যায়ে কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলে-

ترک جنگ و رهزنی ای زن بگو

ور نمی گویی به ترک من بگو

(Mowlavi, 1386: 85)

বাঙলায়ন:

হে নারী, তুমি যুদ্ধ ও রাহাজানি পরিত্যাগ করতে বলো ঠিকই

কিন্তু কখনো তো আমাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা বলোনা।

এই বেইত থেকে উপলব্ধি করার মত দু'টো বিষয় রয়েছে। প্রথমত, স্বামী তার স্ত্রীর অবুঝ আচরণের দরুন বিরক্ত হয়ে স্ত্রীকে কটু কথা বলেছে। যেন তার স্ত্রী এই মন্তব্যে লজ্জিত হয়ে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে। দ্বিতীয়ত, স্ত্রী তার স্বামীর অসচ্ছলতায় অতিষ্ট হয়ে স্বামীকে কটু কথা শোনালেও দিন শেষে সে তার স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করেনি।

নারী প্রশান্তি দায়িনী

অপর গল্পে এসেছে- নারী যখন সাধারণ কথা দ্বারা তার স্বামীকে বশীভূত করতে ব্যর্থ হয় তখন সে কান্নার আশ্রয় নেয়। আর এই অশ্রু পুরুষের ক্রোধানলকে শান্ত করে দেয়। প্রেমের আগুন সব আক্রোশ মিটিয়ে হৃদয়-মন ভরিয়ে দেয়। রুমি বলেন-

زن چو دید او را تند و تونس است گشت گریان، گرچه خود دام زن است

گفت از تو کی چنین پنداشتم از تو من اومید دیگر داشتم

زن در آمد از طریق نیستی گفت من خاک شمایم نیستی

جسم و جان و هرچه هستم آن تست حکم و فرمان جملگی فرمان تست

(Mowlavi, 1386: 85-86)

বঙ্গানুবাদ:

নারী যখন পুরুষকে অবাধ্য ও উগ্ররূপে দেখে, তখন সে কাঁদতে শুরু করে। নারীর কান্না হলো এক প্রকার ফাঁদ।

সে (নারী) বলে, আমি তোমাকে এমন মনে করি যে, তুমি আমার জন্যে ভিন্ন কিছু করবে।

আমি (নারী) যে পথের পথিক, তুমি তার অনুসারি নও; আমার অস্তিত্ব তোমাতেই, কেন বোঝোনা তুমি!

আমার হৃদয়-শরীর জুড়ে যা আছে তোমার সবই, আমার উপর কার্যকর শুধু ফরমান তোমারি।

নারী প্রভাব বিস্তারকারিনী

নারীর মাঝে রয়েছে স্রষ্টার গুণের প্রতিভাস। সে মানুষের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। রুমি বলেছেন-

گفت پیغمبر که زن بر عاقلان غالب آید سخت و صاحبدلان

باز بر زن جاهلان چیره شوند ز آنکه ایشان تند و بس خیره روند

(Mowlavi, 1386: ৪৭)

অর্থ:

নবি বলেছেন নারীর প্রভাব গুনীজনকে পরিণত করে মহৎ হৃদয়ের মানবে,

বুদ্ধিহীনের মূর্খতা ও উগ্রতা দূরীভূত হয় ঐ একই প্রভাবে ।

নারী দুর্বল চিত্তের অধিকারি

নারী আত্মা ও বুদ্ধিমত্তার বিবেচনায় পুরুষের তুলনায় দূর্বল। স্রষ্টার পক্ষ থেকে নারীর গঠন শৈলী এমনই। মাওলানা বলেছেন-

خواب زن کمتر ز خواب مردان از پی نقصان عقل و ضعف جان

(মাসনাভি, দাফতারে আভভাল: ৫২২)

বঙ্গানুবাদ:

নারীর স্বপ্ন পুরুষের তুলনায় কিছুটা শিথিল হয়ে থাকে,

আর তা তাদের শারীরিক দূর্বলতা ও বুদ্ধির স্বল্পতার কারণে।

স্বপ্ন ছোট বলতে এখানে ঘুমের মাঝে স্বপ্নযোগে মানুষ যা দেখে তার দৈর্ঘ্য বোঝানো হয়নি। বরং মানুষের জীবনের স্বপ্ন অর্থ্যাৎ অনাগত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের কথা বোঝানো হয়েছে।

বাদশাহ ও কানিজের গল্প

মাসনাভিতে এক বাদশাহ ও কানিজের মনোরম প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। একদিন শিকারে বের হয়ে বাদশাহ বনে সুন্দরী এক কানিজের সাক্ষাৎ পায়। প্রেমে আসক্ত হয়ে কানিজকে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাসাদে নিয়ে আসে। তবে ধীরে ধীরে সে অসুস্থ হতে থাকে। কারণ সে এক সুদর্শন স্বর্ণকারকে ভালোবাসতো। বাদশাহর আদেশে কানিজকে সুস্থ করার উদ্দেশ্যে স্বর্ণকারকে তার সামনে আনা হয়। যার ফলে সে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে। প্রাসাদের বিত্ত-বৈভবে স্বর্ণকার অসংযমী জীবন যাপন করতে থাকে। যার ফলে সে নিজের সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে। স্বর্ণকারের ভগ্ন স্বাস্থ্য ও চেহারার মাধুর্যহীনতার কারণে কানিজের মন থেকে ভালোবাসার প্রভাব শিথীল হতে থাকে। আর এক পর্যায়ে তাদের ভালোবাসা হারিয়ে যায় এবং কানিজ প্রভাবশালী বাদশাহর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। মাসনাভিতে গল্পটি এভাবে এসেছে-

اتفاقا، شاه روزی شد سوار با خواص خویش از بهر شکار

یک کنیزک دید شه، بر شاه راه شد غلام آن کنیزک، جان شاه

مرغ جانش در قفس چون می طپید داد مال و آن کنیزک را خرید

چون خرید او را و برخوردار شد آن کنیزک، از قضا بیمار شد

(মাসনাভি, দাফতার: ১, বাখশ: ৩৫, পৃ:১৮)

মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়েও তার মনের সৌন্দর্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর যে প্রেম বাহ্যিক রূপ দেখে হয়, তা প্রকৃত কোনো প্রেম নয়।

লাইলি ও খলিফার গল্প

মাসনাভির গল্পে এসেছে -

گفت لیلی را خلیفه، کان توی کز تو مجنون شد پریشان و غوی؟

از دگر خوبان تو افزون نیستی گفت: خاموش چون تو مجنون نیستی

(মাসনাভি, দাফতার: ১, বাখশ: ৬০৫, পৃ:৩৭)

অর্থ:

লাইলিকে খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সেই মানুষ,

যার জন্যে মজনুর এমন পেরেশান-উদভ্রান্ত অবস্থা?

তুমি তো অন্যদের তুলনায় তেমন সুন্দর নও

লাইলি বলে আপনি চুপ থাকুন, কেননা আপনি মজনু নন।

(সৈয়দ আহমদুল হক রচনাবলি, ২০২১: ২৫)

আল্লাহ প্রত্যেকটি মানুষকে অত্যন্ত যত্নের সাথে উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকের মাঝেই সৌন্দর্য রয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যের জন্যে একেক জন একেক জনের সৌন্দর্য খুঁজে পায় আর তাতেই তারা মুগ্ধ হয়।

মা হিসেবে অগ্নি পরিক্ষায় নারী

জনৈক কাফের বাদশাহ এক নারীকে তার সদ্যোজাত পুত্র সন্তানসহ এক মূর্তির সামনে হাজির করে সেই প্রতিমাকে সেজদা করতে বাধ্য করে এবং বলা হয় যে, সে যদি তা না করে তাহলে তার পুত্রকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হবে। মহিলাটি পূর্ণ ঈমানদার ছিলেন। বাদশাহর কথা অমান্য করলে তার কোল থেকে শিশুটিকে আগুনে নিক্ষেপ করায়, তার ঈমান দোদুল্যমান হয়ে ওঠে এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রতিমাকে নয় বরং তার (প্রতিমা) দিকে সেজদা করবে। কেননা শরিয়াতে প্রাণ রক্ষার ক্ষেত্রে এই বিধান আছে। ঠিক তখনি আগুনের ভেতর থেকে সন্তানের আহ্বান শুনতে পায় যে মা তুমিও এই আগুনে এস। বাহ্যিকভাবে তা আগুন হলেও প্রকৃতরূপে তা অত্যন্ত শান্তির জায়গা। (সিরাজুল ইসলাম (অনুবাদক), ২০১১: ২৫৬-২৫৭) মাসনাভিতে ঘটনাটি এভাবে এসেছে-

یک زنی باطفل آورد آن جهود پیش آن بت و آتش ادر شعله بود

گفت ای زن پیش این بت سجده کن ورنه در آتشبسوزی ای سخن

بود آن زن پاک دین و مومنه سجده آن بت نکرد آن موقنه

طفل ازو بستد دز آتش در فگند زن بتر سید و دل از ایمان بکند

خواست تا او سجده آزد پیش بت بانگ زد آن طفل که انی لم امت

(মাসনাভি, দাফতার:১, বাখশ: ৭৮৫, পৃ:৫৭)

একটি পরিবারে মা এমন একজন সদস্য যিনি তার পুরো পরিবারের খেয়াল রাখেন। পরিবারের সকলকে স্নেহ-ভালবাসার উষ্ণতায় জড়িয়ে রাখেন। স্বামী ও সন্তানদের কোনো বিপদে তা মোকাবেলা করার সামর্থ্য রাখেন। স্রষ্টা মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত নির্ধারিত করে রেখেছেন। নারী হলো স্রষ্টার সৃষ্টিশীলতার মূর্ত প্রতীক। স্রষ্টা যেমন প্রাণের সৃষ্টি করতে সক্ষম, ঠিক তেমনি নারীর মাঝেও স্রষ্টা দিয়েছেন সেই অসাধারণ ক্ষমতা। নারী সন্তান ধারণ ও জন্মদানে সক্ষম। সৃষ্টিকর্তার গুণে গুনান্বিত নারী। (Sattari, 1374: 215)

নারী-পুরুষের মহব্বতে রয়েছে খোদার তাজাল্লী

মাওলানা নর-নারীর মিলনের মাঝেও খোদাকে খুঁজে পেয়েছেন। কেননা হৃদয়ে প্রেম থাকলে কিরূপ অবস্থা হয় আর না থাকলে কিরূপ হয়, তার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় মাসনাভিতে। নিচে পংক্তিদ্বয় তুলে ধরা হলো-

مرد و زن چون یک شوند آن یک توی چونکه یک ها محو شد آنک توی

(মাসনাভি, দাফতার: ১, বাখশ: ৯১)

নর ও নারী যখন মিলেমিশে এক হয়, ঐ এক তুমি

দু'জন দু'জনের মাঝে বিলীন হওয়ার কারণও তুমি।

পথ ভ্রষ্ট নারী ও দায়ুস স্বামীর কাহিনি

মাওলানা তাঁর কাহিনিতে এই দু'জন স্বামী-স্ত্রীর মোহগ্রস্থ দুনিয়াদারিত্বের কথা বলেছেন। দুনিয়াতে সঠিক পথে চললে আল্লাহকে পাওয়া যায়। অন্যথা হলে দুনিয়া ও আখেরাত সব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাসনাভির পংক্তিদ্বয় এরূপ-

آب در کشتی هلاک کشتی است آب اندر زیر کشتی پشتی است

چیست دنیا از خدا غافل شدن نه که مس و نقره و فرزند و زن

(মাসনাভি, দাফতার:১, বাখশ: ৫০)

মানুষ বেশি দুনিয়াদার হলে পরিণামে জাহান্নামে ডুবে যাবে,

আল্লাহ ও রাসুলের পথে চললে সে তীরে পৌছে যাবে।

দুনিয়া কি? স্রষ্টার প্রতি উদাসীন থাকার নাম দুনিয়া

আসবাবপত্র-সম্পদ-সন্তান-স্ত্রী দুনিয়া নয়।

ধাত্রীমাতা হযরত হালিমা ও মুহাম্মদের সা. মোজেজার ঘটনা

শিশু মুহাম্মদ সা. মাতৃদুগ্ধ পানের অভ্যাস ত্যাগ করলে মা হালিমা তাঁকে পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের গৃহে পৌছে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং কাবাঘরের এক স্থানে মুহাম্মদকে সা. রাখলেন। হঠাৎ গায়েবি আওয়াজে শুনতে পেলেন, ওহে হাতিম! (কাবাঘর ও দেয়ালঘেরা মধ্যবর্তী জায়গা) আজ তোমার পরম সৌভাগ্যের দিন। কেননা শিশু মুহাম্মদ সা. তোমার নিকট এসেছে।

কথাগুলো শুনে মাতা হালিমা উৎকণ্ঠিত হয়ে দেখলেন মুহাম্মদ সা. সেই স্থানে নেই। তিনি কাবাঘরের বড় মূর্তি উজ্জার নিকট গিয়ে নবি সা. এর খোঁজ করলেন। তখন মূর্তিটি বলল- আমাদের শত্রুর খোঁজ করছ? সে ই তো আমাদের ধ্বংস করবে। আব্দুল মুত্তালিবের কাছে গায়েবি আওয়াজে শিশু মুহাম্মদ সা. কোথায় আছেন সে খবর আসে। আর সেখান থেকেই তাঁকে পাওয়া যায়। এই ঘটনার আলোকে মাসনাভিতে এই চরণগুলো এসেছে।

ظاهرش را شهره گیهان کنیم باطنش را از همه پنهان کنیم

زانکه دارد خاک شکل اغبری وز درون دارد صفات انوری

ظاهرش با باطنش گشته به جنگ باطنش چون کوهر و ظاهر چو سنگ

(মাসনাভি, দাফতার: ৪, বাখশ: ৪০)

তাঁর বাইরের দিকটা পৃথিবীর কাছে প্রসিদ্ধ তবে ভেতরের দিকটা সকলের থেকে গোপন,

মাটির বাইরের আবরণ ধুলা-বালি সদৃশ তবে তাতে আছে নুরের আকর।

বাহির ও ভিতর পরস্পরের সাথে সংঘবদ্ধ নয় ঠিকই;

বাহ্যিক রূপ পাথর হলেও প্রকৃতরূপে সে রত্ন-ভাণ্ডার।

কন্যার প্রতি পিতার উপদেশ

এক লোকের সুশ্রী কন্যা ছিল। সে বালেগ হয়ে উঠলে তার পিতা তড়িঘড়ি করে কোনো বাছ-বিচার ছাড়াই এক যুবকের সাথে তার কন্যার বিবাহ দেয়। তবে নিম্নবর্ণের স্বামী থেকে কোনো সন্তান না নেওয়ার আদেশ দেন। কিন্তু মেয়েটি একটি সন্তানের জন্ম দেয় আর এই বিষয়টি তার বাবার থেকে কিছুদিন গোপন রাখে। মেয়েটির বাবা সত্য জেনে ফেললে তাকে অনেক ভর্ৎসনা করে বলে, কেনো তুমি নিজেকে সংবরণ করলেনা? মেয়েটি বলে- নারী ও পুরুষের মিলনের সময় তীব্র আবেগে নিজেকে সংবরণ করা সম্ভব নয়। আর তাই আমি তোমার আদেশ পালনে ব্যর্থ হয়েছি।

মাসনাভিতে এসেছে-

نیست هر عقلی حقیری پایدار وقت حرس و وقت جنگ و کارزار

(মাসনাভি, দাফতার: ৫, বাখশ: ১৫৯)

লোভ ও যুদ্ধের সময় মানুষের সুকুমার আচরণ, যুক্তি ও বুদ্ধি কোনোটাই স্থির থাকতে পারেনা। আর তাই বিবেচনা প্রসূত আচরণ করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

হযরত মুহাম্মদ সা. ও হযরত আয়েশা রা. এর বৃষ্টির ঘটনা

একদিন প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ হলে বিবি আয়েশা সিদ্দিকা রা. অত্যন্ত নম্রকণ্ঠে ভালোবাসার সুরে আদব সহকারে নবি মুহাম্মদ সা. কে বৃষ্টিপাতের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বললেন- আজকের এই বৃষ্টিপাতের কারণ কি? এটা কি রহমতের বর্ষণ নাকি স্রষ্টার পক্ষ থেকে সতর্কতাবাণী? এটা কি আল্লাহর রহমতপূর্ণ নাকি বিপদাপদপূর্ণ বারিবর্ষণ?

রাসুল সা. বলেন- আদম সন্তানের উপর শান্তি বর্ষণকারি বৃষ্টি এটি। স্রষ্টা যদি এই রহমত বর্ষণ না করতেন তবে মানুষ চিন্তা-ভাবনার আগুনে ভস্ম হত। কর্মজগৎ অচল হয়ে যেত। মানব মনে কর্মস্পৃহা জাগাতে রহমত স্বরূপ এই কুদরতি বৃষ্টিপাত হলো। এই ঘটনার আলোকে মাসনাভিতে এসেছে-

پس سوالش کرد صدیقه ز عشق باخشوع و بادب از جوش عشق

کای خلاصه هستی وزبداه وجود حکمت باران امروزی چه بود

این ز بار انهای رحمت هاست یا بهر تهدیدات و عدل کبریا

این ازان لطف و بهاریات بود یاز پـهز پر آفات بود

گفت این از بهر تسکین غم است کز مصیبت بر نزاد آدم است

گر بر آن آتش بما ندهی آدمی بس خرابی افتادی و کمی

این جهان ویران شدی اندر زمان حرص ها بیرون شدی از مردمان

(মাসনাভি, দাফতার:৩)

হযরত আয়েশা রা. রাসুল সা. এর বাণী ও উপদেশ মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং পরবর্তীতে নারী সাহাবিগণের সাথে সেই বিষয়ে আলোচনা করতেন। জীবন যাপনের নিয়ম-কানুন যথাযথ ভাবে পালন করার বিধান সম্পর্কে জ্ঞান দান করতেন। আয়েশা রা. সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের আয়াত গণনার কাজ শুরু করেন। ইসলাম প্রচারে নবিপত্নী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। (আহমেদ, ১৯৯৮: ১১)

নারী ঈর্ষাপরায়ণ

মাওলানা রুমি নারীর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর মাসনাভিতে। নারীর রূপ, বৈচিত্র্যের মাঝে এমন কিছু বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে যা পশুর বৈশিষ্ট্যের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। মাসনাভিতে এক নারীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যেখানে নারীটি গাধার সাথে কুরুচিপূর্ণ ও অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়। যার পরিণাম অত্যন্ত খারাপ হয়।

وصف حیوانی بود بر زن فزون زان که سوی رنگ و بو دارد رکون

(মাসনাভি, দাফতারে পানজুম:১৫৮)

অর্থ:

নারীর মাঝে পশুত্বের গুণাবলী বেশি থাকে

পশুত্বের রং, গন্ধ তারা ধারণ করে থাকে।

নারী অপরিপক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন

রুমির ভাষায়,

گفت اگر کودک در آید یا زنی کو ندارد رای و عقل روشنی

گفت با او مشورت کن، آنچه گفت تو خلاف آن کن و در راه افت

نفس خود را زن شناس از زن بتر زان که زن جزوی است، نفست کل شر

(মাসনাভি, দাফতারে দোভভোম: ৩৭৩)

অর্থ:

যদি কোনো নারী অথবা বাচ্চা আসে, তাদের থেকে বুদ্ধিদীপ্ত কিছু আশা করা যায়না।

সে সবসময় সব বিষয়ে পরামর্শ করতে বলবে, তবে কাজের সময় ঠিক তার উল্টোটা করবে।

নারীরা নিজেদের নফস্ কে খারাপ হিসেবেই চেনে, কেননা তাদের নফস্ পুরোটাই খারাপ।

নারী পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণকারি

জালালুদ্দিন রুমি বলেছেন-

زن به دست مرد در وقت لقا چون خمیر آمد در دست نانبا

بر شود گاهیش نرم و گه درشت زو بر آرد چاق چاقی رثزمست

(মাসনাভি, দাফতারে শেশোম: ৫১৭)

অর্থ:

নারী যখন পুরুষের সংস্পর্শে আসে, তখন সে রুটিওয়ালার আটার খামিরে পরিণত হয়,

যার ফলে কখনো সে মোলায়েম হয় আবার কখনো অনমনীয় হয়ে যায়।

রুটিওয়ালা (পুরুষ) আটাকে (নারীকে) মোটা-পাতলা যেকোনো রূপ দেয়।

নারী আধিপত্য বিস্তারকারি

স্রষ্টা প্রদত্ত নারীর যাদুময়ী বৈশিষ্ট্য হলো সে সহজেই পুরুষের হৃদয় হরণ করতে পারে। অর্থ্যাৎ আধিপত্য বিস্তারে অধিক পারদর্শী। বয়সের দৃষ্টিকোণ থেকে নারী পুরুষের তুলনায় দ্রুত পরিপক্ক হয়ে ওঠে। মাসনাভিতে এসেছে-

فضل مردان بر زن ای حالی پرست زان بود که مرد پایان بین ترست

مرد کاندر عاقبت بینی خمست او ز اهل عاقبت چون زن کمست

(মাওলাভি, ১৩৮৭: ২৪২)

অর্থ:

পুরুষের উপর নারীর প্রভাব এমনভাবে বিস্তার করে যে, সাধারণ পুরুষ হয়ে ওঠে দূরদর্শী

পরিণামদর্শীতার বিষয়ে পুরুষেরা নারীর তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে।

নারীর মাঝে প্রধানত দু'টো গুণের সমন্বয় ঘটেছে। এক, স্রষ্টা তাকে যে দেহাবয়ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তার মাঝে মানবীয় যেসকল গুণের সমন্বয় ঘটিয়েছেন তা অবশ্যই তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। দুই, অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারকারি হিসেবে নারী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কেননা নারী নানারূপে সমাজের প্রতিটি স্তরে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। নারী প্রেম-ভালবাসার প্রতীক, স্রষ্টার মহব্বতের প্রতীক, খোদার রহমত স্বরূপ, সত্য ও সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক। নারীর কিছু বলিষ্ট রূপের উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

হযরত আসিয়া ছিলেন অত্যাচারি কাফের ফেরাউনের সহধর্মীনী, যিনি কঠিন ইমানি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। হযরত মারিয়াম আ. হলেন হযরত ঈসা আ. এর মাতা। তিনি পবিত্রতার প্রতীক। বিলকিস বানু ছিলেন সাবা'র সম্রাজ্ঞী। শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তিনি। (লারিজানি, তা.বি: ৯০৭-৯০৮)

পবিত্র কুরআনে তিনজন নারীর নাম এসেছে, যাদের জীবনী ও কর্মপন্থা থেকে মানব সমাজ শিক্ষা নিতে পারে। তাঁরা হলেন- হযরত মারিয়াম আ. যিনি স্রষ্টার কাছে অত্যন্ত সম্মানীয়া একজন নারী, মিশরের বাদশাহ পুতিফারের (বাদশাহ আযিয) স্ত্রী জুলাইখা বানু। যদিও অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিক তাঁকে এবং তাঁর চরিত্রকে বদ-নফস্ হিসেবে হিসেবে চিত্রিত করেছেন, কিন্তু বাস্তবে তিনি ছিলেন একজন প্রেমিকা। প্রেম তাঁর অন্তরের আঁধার দূরীভূত করে তাঁকে পবিত্র করেছে। বিলকিস বানুর কথা এসেছে। রুমির মাসনাভিতে এই নারী চরিত্রগুলো অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। ইবনুল আরাবি তাঁর *ফুতুহাতুল মাক্কিয়াহ* গ্রন্থে লিখেছেন- নারীগণ

আধ্যাত্মিকতার স্তরে পৌছাতে পারেন। কেননা স্রষ্টা তাদেরকে সেই সামর্থ্য ও যোগ্যতা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। (মোদাররেসি, তা.বি.: ১২৯-১৩০)

মূসা নবির মায়ের নিকট আল্লাহর ওহি

হযরত মূসা আ. এর মায়ের নাম ইউকাবাদ। কোথাও এসেছে জোহকাবাদ হিসেবে। নবির জন্মের সময় ফেরাউনের কঠিন তাণ্ডবলীলা চলছিল। নবজাতকদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছিল। মূসা নবি জন্ম নিলে তাঁর মা চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। সেই মূহূর্তে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নাযিল হয়। স্রষ্টার নির্দেশানুযায়ি পুত্র মূসাকে পানিতে ফেলে দেওয়া হয়। আর আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে আদেশ করা হয়। মাসনাভিতে ঘটনাটি এসেছে এভাবে-

باز وحی آمد که در آبش فکن روی در اومید دار و مو مکن

(মাসনাভি, দাফতার: ৩, বাখশ: ৯৫৯, পৃ: ২৩৪)

হে মূসার মা! তুমি মূসাকে পানিতে নিক্ষেপ কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখো। দুশ্চিন্তা করে অস্থির হয়ো না। স্রষ্টার কুদরতে মূসা আ. ঠিকই নিরাপদে আশ্রয় পান এবং বড় হতে থাকেন।

এক ব্যভিচারিনী স্ত্রীর গল্প

একজন সুফি সাধকের ব্যভিচারিনী স্ত্রীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে মাসনাভিতে। সুফি সাধক পেশায় একজন দোকানদার ছিলেন। তার স্ত্রী এক মুচির সাথে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত ছিল। আর এই বিষয়ে তিনি সন্দেহ করছিলেন। দিনের বেলায় যুবক মুচিটি ঐ নারীর সাথে মিলিত হত আর রাতের পূর্বেই চলে যেত। একদিন সুফি দিনের বেলায় বাসায় এসে উপস্থিত হয়ে দেখে যে তার ঘরের দরজা বন্ধ। বাড়িতে আর অন্য কোনো দরজা ছিলো না। নারীটি ঐ মুচিকে নারীদের কাপড় পরিধান করিয়ে ঘরের বাইরে তার স্বামীর সামনে আনল। আর মিথ্যা বানিয়ে বলল যে, এই মহিলা সম্ভ্রান্ত বংশের, আমাদের মেয়ের সাথে তার ছেলের বিবাহ দিতে চায়। কিন্তু স্বামী এ প্রস্তাবে রাজি হলোনা। মাসনাভিতে এসেছে-

صوفی آمد به سوی خانه روز خانه یک در بود و زن با کفش زود

(মাসনাভি, দাফতার: ৪, বাখশ: ১৫৯, পৃ: ৬৬)

মাওলানা বলেন, কোনো কোনো নারী এতটাই ছলনাময়ী হয় যে, তারা তাদের মনের প্রকৃত ভাব ও চিন্তা লুকায়িত রেখে স্বামীকে ধোঁকা দেয়। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে সূরা ইউসুফের ২৮ নং আয়াতে বলেন-

انّ كيدكنّ عظيم

''নিঃসন্দেহে তোমাদের (নারীদের) ছলনা খুবই মারাত্নক।'' (আল-কুরআন, ১২:২৮)

নারীর মাঝে যেমন রয়েছে প্রশংসনীয় মানবীয় গুণাবলি, ঠিক পাশাপাশি রয়েছে কিছু খারাপ দিকও। যদিও ভালো খারাপের সংমিশ্রণেই মানুষ। মাসনাভিতে মাওলানা রুমি সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকেই তুলে ধরেছেন নিজস্ব

লেখনীতে। পুরুষের মাঝেও এই একই ধরনের প্রবৃত্তি বিরাজমান। সবকিছু বিবেচনায় মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব 'আশরাফুল মাখলুকাত'। নর-নারীর যৌথ প্রচেষ্টায় পৃথিবীতে সাম্যের বাণী ধ্বনিত হোক।

তথ্যসূত্র

আল-কুরআন

১. আল-কুরআন, সুরা: বাক্কারাহ, আয়াত: ৩৬;
২. আল-কুরআন, সুরা: বাক্কারাহ, আয়াত: ১৮৭;
৩. আল-কুরআন, সুরা: আন-নাহল, আয়াত: ৫৮;
৪. আল-কুরআন, সুরা: আত-তাকবির, আয়াত: ৮-৯;
৫. আল-কুরআন, সুরা: ইউসুফ, আয়াত: ২৮;

ফারসি তথ্যসূত্র

১. গোলামরেযায়ি, ড. মুহাম্মদ (১৩৭০হি.শা)। *দাসতান হয়ে গেনায়িয়ে মানজুম আয অগাযে শেরে ফারসি দারি তা এবতেদায়িয়ে কার্‌নে হাফতোম*, চাপখানেয়ে আহমাদি, তেহরান;
২. কাফাফি, মোহাম্মাদ আব্দুস সালাম (অনুবাদ: সাইয়েদ হোসাইন সায়েদী) (১৩৮২)। *আদাবিয়াতে তাত্‌বিক্বি (পায়ুহেশি দার বাবে নাযারিয়ে আদাবিয়াত ওয়া শেরে দাসতানি)*, এনতেশারাতে আস্তানে কুদস্ রাযভি, শেরকাত বে নাশর্, মাশহাদ;
৩. নিযামি, হাকিম জামাল উদ্দিন আবু মোহাম্মাদ ইলিয়াস বিন ইউসুফ (১৩৮৩)। *খামসায়ে নিযামি বার আসাসে নুসখেয়ে সাদ লু (কার্‌নে হাশতোম হিজরি) ওয়া মাক্বাবেলে বা নোসখেয়ে আকাদেমিয়ে শুরুরি ওয়া তাসহিয়ে ওয়াহিদ দাস্তগারদি*, এনতেশারাতে দুস্তন, তেহরান;
৪. নিকুবাখত, দোকতর নাসের (১৩৭৭)। *মাসনাভিয়ে অ'শেকা'নে ওয়া অ'রেফা'নেয়ে ইউসুফ জুলেখা*, মোসেসেয়ে এনতেশারাতে অভায়ে নুর, তেহরান;
৫. রাযমজু, দোকতর হোসাইন (১৩৮২)। *নাকদ্ ওয়া নাযারি বার শেরে গোযাশতেয়ে ফারসি আয দিদগহে আখলাকে এসলামি*, জেলদে দোভভোম, এনতেশারাতে দা'নেশগাহে ফেরদৌসি, মাশহাদ;
৬. সাদি সিরাজি, শেখ মোসলেহ উদ্দিন, ফোরুগ্বি, মোহাম্মদ আলি (সম্পাদনা) (১৪০০)। *কুল্লিয়াতে সাদি*, হারমাস, তেহরান;
৭. ফাতাহি, যাকিয়া (১৩৯৩)। *নেগাহে মোশতারাকে ইবনে আরাবি ওয়া মাওলাভি (দার বারায়ে মানযেলাতে হাক্বিক্বিয়ে যান দার খালক্বাত)*, ফাসল্ নমেয়ে এলমি-পায়ুহেশিয়ে যান ওয়া জমে, সলে পানজুম, শোমারেয়ে দোভভোম;
৮. কাকানি, আব্দুল জব্বার (১৩৭৬)। *আওয়ায হায়ে নাসলে সোরখ্ নেগাহি বে শেরে মোয়াসারে ইরান আয ১৩৫৭ তা ১৩৬৭*, ইরান;
৯. যামানি, কারিম (১৩৮৭)। *শারহে জমে মাসনাভিয়ে মানাভি*, তেহরান;
১০. লারিজানি, ইসমাইল মানসুরি (তা.বি.)। *যান, এরফান ওয়া সিয়াসাত*, ফাসল নমেয়ে বে উনওয়ানে শিয়ে, সংখ্যা ৩, বাহার:৮৪;

ইংরেজি তথ্যসূত্র

১. Le Bon, Gustavo, Syed Ali Bilgrami (translator) (2016). *Tamaddun-e-Arab,* Al-Balagh Publications;
২. Harmitage Museum (1987). *Gignoux and Gyselen,*St. Petersberg Russia;
৩. Boyce & Mary (2001). *Zorostrians: their religious beliefs and practices,* Routledge, New York;
৪. Idem (1997). *Women's Robing in the Sasanian Era,* Iranica Antiqua 32;
৫. Ehsan, Yarshater (1983). *Cambridge history of Iran the Seleucid, Parthian and Sasanians periods,* USA;
৬. Malik, Fida Hussain (1983). *Wives of the Prophet,* Ashraf Publications, Lahore;
৭. Ghazali, M. (1376). (Forth edition) *Revival of Religious Knowledge,* M.M. Kharazmi (translator), Scientific & Cultural Publications, Tehran;
৮. Rose, J. (1998). *Three Queens, Two Wives, One Goddess: The Roles and Images of Women in Sasanian Iran, in Women in the Medieval Islamic World: Power, patronage and piety,* (ed. G.Hambly), New Middle Ages 6, New York;
৯. Moin, Muhammad (2006). *Tahlil-i Haft paykar-i Nezami,* Tehran;
১০. *KOSROW O SIRIN- Encyclopedia Iranica,* Iranicaonline.org. Archived from the original on 2014-04-17. Retrieved 2014-03-23;
১১. Ganjavi, N (tras. By Rogers, L) (2002). *Fire of Love: The Love Story of Layla and Majnun,* Writers club press, New York;
১২. Seyed-Gohrab, Dr. Ali Asghar (2003). *Layli and Majnun: Love, Madness and Mystic Longing,* Brill Studies in Middle Eastern Literature;
১৩. Ghazali, M. (1376). *Revival of Religious Knowledge,* Translated by M.M.Kharazmi, forth edition, scientific and Cultural Publications, Tehran;
১৪. Mowlavi, J. (1386). *Mathnavi Ma'navi,* 3rd edition, Aaban Publications, Tehran;
১৫. Sattari, J. (1374). *Sufi Love,* Marquaz Publications, Tehran;

বাংলা তথ্যসূত্র

১. হেমা, আসমা জাহান (২০২০)। *ইসলামের ছায়াতলে নারী*, আল-এসহাক প্রকাশনী, ঢাকা;
২. খালেক, আব্দুল (১৯৯৫)। *নারী ও সমাজ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা;
৩. আস-সাবায়ী, ড. মুস্তফা, আকরাম ফারুক (অনূদিত) (১৯৯৮)। *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা;
৪. ইসলাম, কামরুল (২০১৪)। *রামমোহন রায়: সমাজ ও সাহিত্য*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা;
৫. আফিফী, মুহাম্মদ সাদিক (তা.বি)। *আল-মারতুওয়া, আল-মারআহ ওয়া হুকুকুহা ফিল ইসলাম*, দারুল ইহইয়াইতু তুরাসিল আরাবি, বৈরুত;
৬. দৌলাতানা, মমতাজ (১৯৯৭)। *ধর্ম, যুক্তি ও বিজ্ঞান*, জ্ঞানকোষ প্রকাশনা, ঢাকা;

Dhaka University Institutional Repository

৭. বড়-য়া, ড. সনন্দা (১৯৯৬)। *ধর্মের আলোকে নারীর অবস্থান*, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন, স্মরণিকা, ঢাকা;

৮. কাদের, ড. এম. আব্দুল (১৯৯০)। *নানা ধর্মে নারী*, চট্টগ্রাম: ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ;

৯. জাফর, আবু (২০০১)। *নারী স্বাধীনতা: ইসলাম ও পাশ্চাত্য বিশ্ব*, পালাবদল পাবলিকেশন্স লি., ঢাকা;

১০. আব্দুল আ'লা, সাইয়েদ (১৯৮৭)। *পর্দা ও ইসলাম*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা;

১১. সিমোন, ডি. বিভোয়া (২০০১)। *দ্য সেকেন্ড সেক্স*, ঢাকা: এশিয়াটিক পাবলিকেশন্স;

১২. হিট্টি, ফিলিপ. কে (২০০৩)। *আরব জাতির ইতিহাস*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা;

১৩. রুবেন, লেভি, (অনুবাদ: গোলাম রসুল) (১৯৯৫)। *সোস্যাল স্ট্রাকচার অব ইসলাম*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা;

১৪. ইউসুফ, ইসলাহী (অনুবাদ: আবদুল কাদের) (১৯৯৫)। *মাতা পিতা ও সন্তানের অধিকার*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা;

১৫. কাদির, সাযযাদ (২০০৭)। *হারেমের কাহিনী জীবন ও যৌনতা*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা;

১৬. ইয়াসমিন, তহমিনা (২০১১)। *আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা;

১৭. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী (২০০৪)। *মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আদর্শ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা;

১৮. খলিল, ড. মোঃ ইব্রাহীম ও রশীদ, ড. মোহাম্মদ হারুনূর (২০১৫)। *আল-কুরআনের মানব দর্শন: পর্যালোচনা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৫৪বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা;

১৯. বাহাউদ্দিন, ড. মোহাম্মদ (২০১৯)। *ইসলাম ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি*, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা;

২০. বাহাউদ্দিন, ড. মোহাম্মদ (২০১৪)। *ইসলাম ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ*, আবিষ্কার, ঢাকা;

২১. মুসলেহউদ্দীন, আ ত ম (১৯৮৬)। *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা;

২২. ইউসুফ, মনিরউদ্দীন (১৯৯১)। *শাহনামা ১ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা;

২৩. আহমদ, ওয়াকিল (২০০৯)। *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান*, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা;

২৪. সরকার, মো. আবুল কালাম (২০১৫)। *বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য ১৯৭১-২০০৫*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা;

২৫. বাহরাম খাঁ, দৌলত উজির (আহমদ শরীফ সম্পাদিত) (১৯৫৮)। *লাইলী মজনু*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা;

২৬. শেখ সাদী, আল্লামা (রহ), মাওলানা কারী মো: হাসান (অনুবাদ) (২০০৬)। *শেখ সাদীর শ্রেষ্ঠ ১৫২ গল্প*, সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা;

২৭. শেখ সাদি, নিজামী, মাহমুদুল হাসান (কাব্যানুবাদ) (২০১৭)। *মহাকবি শেখ সাদীর কালজয়ী গ্রন্থ বোস্তাঁ*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা;

২৮. হাদী, মোহাম্মদ আহসানুল (২০১৫)। *ইরানের আধুনিক কবি মুহাম্মদ হোসাইন শাহরিয়ার*, ইসলামি দর্শন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা;

২৯. সবুর, শাকির (২০২০)। *সমকালীন ইরানের কবি ও কবিতা*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা;

৩০. *সৈয়দ আহমদুল হক রচনাবলি (মসনভি শরিফের কাহিনিসম্ভার)*, ৩য় খণ্ড, মাওরা ব্রাদার্স, ঢাকা;

৩১. আহমেদ, মো. জামিউল (১৯৯৮)। *পবিত্র আল কোরআনের বিষয়ভিত্তিক বাণী*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা;

৩২. মোদাররেসি, ফাতেমা (তা.বি.)। *যান দার আনদিশে ওয়া যেন্দেগিয়ে মাওলানা*, ফাসল নমেয়ে আদাবিয়াতে এরফানি ওয়া এসতুরে শেনাখতি, সংখ্যা ২০, যেমেস্তান ৮৯;

Web Address

১. https://bn.emsayazilim.com

২. https://bn.m.wikipedia.org

৩. www.onnoekdiganta.com খান, মুহাম্মদ মনজুর হোসেন (৩০ মার্চ,২০২১)। *নানা ধর্মে নারীর মর্যাদা;*

৪. https://bn.eferrit.com;

৫. www.roarmedia.com Feature writer: Iqbal Hossain Porosh, Date: 29 November, 2019;

৬. https://en.m.wikipedia.com;

৭. www.daily-bangladesh.com সিরাজ, হাবীবুল্লাহ (১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০)। *বিভিন্ন ধর্মে নারীর প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি;*

৮. https://bn.banglapedia.org; মানুচি, নিকোলো;

৯. https://www.irna.ir; *ওয়ারকা ওয়া গোলশান: আশেক ওয়া মাশুক কে বে দাস্তে পেইগাম্বারে সা. যেন্দে শোদান্দ*, প্রকাশিত: ৩ মোরদদ, ১৩৯৬;

১০. https://en.m.wikipedia.org;

১১. https://ganjoor.net>boostan>bab3;

১২. https://ganjoor.net>golestan>gbab2;

১৩. https://en.m.wikipedia.org sohrab sepehri.

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ফারসি সাহিত্যের আগমণ ঘটেছে অতি প্রাচীনকাল থেকেই। মরুময় আরব ভূখণ্ড থেকে সুফিবাদি চেতনার উন্মেষ ঘটে। ইসলাম প্রবর্তনের পর থেকেই মূলত এ ধারার প্রচলন শুরু হয়। আরবের মরুঞ্চল থেকে শুরু হয়ে এই অধ্যাত্মবাদ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। ফারসি মরমি সাহিত্য সম্পর্কে ফারসি সাহিত্যানুরাগীগণ অনেকটাই অবহিত। জালালুদ্দিন রুমির প্রেমময় সুর আর তার ছন্দোবদ্ধ ছত্রে যে গুঢ়তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে, সেটা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে হলে, অবশ্যই একজন পাঠককে প্রকৃতরূপে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হতে হবে। কেননা কোনো মানুষের হৃদয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব ঠিক ততখানি প্রগাঢ়, যতটা ঐ ব্যক্তি তার স্রষ্টায় বিশ্বাসী।

মরমি মনোভাব দ্বারা মাসনাভিকে পাঠ করলে আমরা তার লুকায়িত রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হবো। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে পর্যায়ক্রমে আলোচিত হয়েছে- ফারসি মরমি বা সুফি ভাবধারা প্রসঙ্গে, জালালুদ্দিন রুমির জীবনবোধ ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির পারস্পারিক সম্পর্ক, রুমি রচিত মাসনাভির আদ্যোপান্ত এবং মাসনাভিতে আলোচিত বেশকিছু নারী চরিত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। যে সমস্ত নারী চরিত্রের মাঝে রয়েছে নানা ভিন্নতা। সৎ এবং বলিষ্ঠ চিত্তের অধিকারী একজন নারীর আত্মবিশ্বাস, খল চরিত্রের নারীর গল্প, সম্রাজ্ঞী হিসেবে নারীর অবস্থান, প্রেমিকা, সহধর্মীনী, মাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে ফুটে উঠেছে নারী চরিত্রের নানামুখী রূপ। ব্যভিচারিণী নারীর চারিত্রিক কদর্যতার বর্ণনাও রয়েছে এতে। আর এই প্রত্যেকটি চরিত্রের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের পাশাপাশি সমাজের মানুষের উপর এর প্রভাব এবং শিক্ষণীয় বিষয় আলোচিত হয়েছে।

আমার বিশ্বাস এ অভিসন্দর্ভটি পাঠ করে নবীণ গবেষকগণ এবং পাঠকশ্রেণি নতুন তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ হবেন এবং ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন নতুন গবেষণাকর্মে নিজেদের নিয়োজিত করবেন।